।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

অসুখের – বেদনার অন্তহীন স্রোত
('দেওয়াল '– 'খড়কুটো '–'পূর্ণ অপূর্ণ'–
'যদুবংশ '–'দ্বীপ '–'হৃদয়তল'–
'বেদনাপর্ব '–'গ্রন্থি '–'উত্তরের হাওয়া')

তিনপর্বে সম্পূর্ণ বিশাল উপন্যাস 'দেওয়াল'-এর প্রথম পর্ব 'ছোটঘর' (১৩৬৩)। এই পর্বের ঘটনাকাল ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে জুলাই ১৯৪২ পর্যন্ত। আলোচিতব্য অংশের মধ্যে ২য় বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ত এবং ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে কলকাতার বুকে ফটিক দে লেনে একটি পরিবারের জীবন ও যন্ত্রণার ছবিকে উপন্যাসকার বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন। এই পর্বে আমরা দেখতে পাই সুধা নামের মেয়েটি সমস্ত সংস্কার এবং প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বাড়ির গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। অসহায় পরিবারের সকলকে প্রতিপালনের দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। একমাত্র ভাই বাসু দিদির এই প্রাণপাত পরিশ্রমকে মূল্য দিতে রাজি নয়। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণই অ-সচেতন। দিন-রাত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তার আড্ডা। মা রত্নময়ী প্রথমে অস্বীকৃত হলেও সম্বলহীন অবস্থার চাপে সুধার এই চাকরি করার ব্যাপারটাকে না মেনে পারেননি। মা–ভাই--বোনের যাবতীয় দায় ও দায়িত্ব সুধা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে -- যেহেতু অন্য কোনও উপায় খোলা ছিল না; কিন্তু সেও ক্রমশ হাঁফিয়ে উঠেছে। একঘেঁয়েমি আর ক্লান্তি ধীরে ধীরে তাকে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছে। সুধার প্রচন্ড হতাশার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা সহকর্মী সুচারু। তার বন্ধুত্ব –সহানুভূতি সুধার অন্ধকার মনে আলোর রেখা। এই জন্যেই ভীরু আশা গুনগুনিয়ে উঠে সুধার ক্লান্ত বুকে। সহসাই কিন্তু তার চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে। মহাযুদ্ধে যোগ দিতে চায় সুচারু। ধরাবাঁধা জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ সুচারুর মনে বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষের ভিতরেও অন্য কিছু অন্বেষণের তাগিদ। সুধার কাছ থেকে সে বিদায় চেয়ে নেয়। সুচারু বলে — ফিরে এসে সে সুধাকে আবার খুঁজে নেবে। সুধা জানায় --বেঁচে থাকলে সেও সুচারুর জন্যে অপেক্ষা করবে। সুচারুকে এ কথা বলে বিদায় জানানো ছাড়া এই মুহূর্তে সুধার সামনে অন্য উপায় কী? সুচারু যে এখন অনেক বড় কিছুর প্রত্যাশী; বহির্জগতের নতুন কিছুর সন্ধানে চঞ্চল ও সতৃষ্ণ।

কি-তু সুধাকে এই ছোট গণ্ডির মধ্যেই বন্দি থাকতে হবে । তার ওপর ন্যস্ত বিরাট দায়িত্বভার । সুধার ঘরটাও এত ছোট যে নিজের মত জায়গারও সেখানে বড় অভাব ।

বহুবাজার স্ট্রীটের গায়ে লেগে থাকা ফটিক দে লেনের এক ভাড়া বাড়িতে সুধাদের বাস । সে প্রথমে পাড়ার মেয়ে স্কুলটায় চাকরি করত, মাইনে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা । দুটি বাচ্চা মেয়েকে পড়িয়ে আরও দশটা টাকা হত । বরাত জোরেই মিশন রো-র বিরাট অফিসটাতে সে চাকরি পেয়ে গেছে । এ ব্যাপারে অমলা যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সুচারু বাবুও। দুজনের কাছেই সুধা সমানভাবে কৃতজ্ঞ । যুদ্ধ না বাধলে চাকরিটা বোধহয় জুটত না ।

> আর এ-চাকরি না পেলে উপবাস—অনটনের
> মাত্রাটা আরও বাড়ত । কাজেই যে যুদ্ধ ওদের
> মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, সুধা মনে মনে তার ওপর
> কৃতজ্ঞ থাকা ছাড়া আর কী থাকতে পারে ।

একসময় অনেক আশা নিয়েই রত্নময়ীরা গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। স্বামী চন্দ্রকান্ত ছিলেন সততা ও উদারতার প্রতিমূর্তি; অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর । বই ছাড়া আর কিছুই জানেন না তিনি । প্রতিবেশী মোহিত ঠাকুরপোর কলকাতায় বই-এর ব্যবসা । শহরে চলে আসার জন্যে সেই জোর করেছিল । চন্দ্রকান্তর মত পণ্ডিত নিশ্চয়ই কলকাতার বুকে সমাদৃত হবেন, ফলে আর্থিক কষ্টও দূর হবে, এই ছিল তার ধারণা । চন্দ্রকান্তর কি-তু গ্রাম ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে তেমন একটা সায় ছিল না ।

> কলকাতায় যাব রোজগার বাড়াতে ? না না—দরকার
> নেই রোজগার বাড়ানোর । সে এক বিদঘুটে শহর,
> গোলমাল, চেঁচামেচি, হৈচৈ, আকাশ নেই, বাতাস
> চলতে পথ পায় না, রোগ ময়লা । এই আমার
> ভাল, বর্ধমানের এই ছোট্ট গ্রাম । এখানে বাপ-
> পিতামহের ভাঙা ভিটেতেও বেশ আছি শান্তিতে ।
> স্কুলে পণ্ডিতি করি । পুঁথিপত্তর পড়ি । কী
> দরকার আমার কলকাতায় গিয়ে ।

শেষপর্যন্ত অবশ্য রত্নময়ী আর মোহিতের তাগিদে চন্দ্রকান্ত রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার কিছু দিন সুখেরই ছিল। রত্নময়ী ভেবেছিলেন ভাগ্য বোধ হয় ফিরল এবার।

কিন্তু ভাগ্য কী নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক। রত্নময়ীকে একটু লোভ দেখিয়ে খানিকটা উজ্জ্বল রোদ দেখিয়ে সহসা সব কালো হয়ে গেল। চন্দ্রকান্ত সেবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন পুজোর মুখে মুখে। তারপর টাইফয়েড বাইশ দিনের মাথায় স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের ভার এই জনকোলাহলময় কলকাতা শহরের অদৃশ্য অধিষ্ঠাতার হাতে সমর্পণ করে বিদায় নিয়ে গেলেন।

রত্নময়ীর কত সাধ ছিল সুধাকে ভাল পাত্রের হাতে তুলে দেবেন। বাসুকে উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। এ ছাড়া আরতিও রয়েছে। রত্নময়ী কিন্তু আরতির গর্ভধারিণী নন। দূর সম্পর্কের এক মাসীর মেয়ে পার্বতী --সেই তার মা।

পার্বতীর স্বামী লোক ভাল ছিল না। নেশা ভাঙ করত, চরিত্রদোষ ছিল, তিন-তিনটে বিয়ে করেছিল কন্যাপক্ষকে ঠকিয়ে। সে এক ইতিহাস। অমন শয়তানটাই শেষ পর্যন্ত পার্বতীর নামে কলঙ্ক রটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। পার্বতী তখন অন্তঃসত্ত্বা।

এই অবস্থায় অসহায় মেয়েটিকে সস্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলেন রত্নময়ী। আরতি যখন জন্ম নিল --পার্বতী তখন ঘোর উন্মাদ। কিছু দিনের মধ্যেই মারা গেল সে। সেই থেকেই আরতির মা-রত্নময়ী। চন্দ্রকান্ত রত্নময়ীর মমতা আর স্নেহ দিনে দিনে বড় করে তুলছিল আরতিকে।

স্বামী মারা যাওয়ার পর রত্নময়ী সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন ছেলের কাছ থেকে। বাসুকে ঘিরে তাঁর মনে কত স্বপ্ন ছিল -- সব তছনছ হয়ে গেল। চন্দ্রকান্তর মত মানুষের ছেলে হয়ে ছেলেটা এরকম মূর্খ বদমাশ হয়ে উঠল কী করে রত্নময়ী ভেবে পান না। নিত্য অভাব, বাসুর চরম ঔদাসীন্য, রত্নময়ীর সংস্কার-

বোধের ভিতকে টলিয়ে দিয়েছিল ।

'খেতে না পেয়ে মরবে, হাত পাতবে এর
তার কাছে, —বাড়ি-ভাড়া দিতে না পারার জন্যে
অপমান সইবে—তাও ভাল তবু মিথ্যে মর্যাদার
জন্যে মেয়েকে চাকরি করতে দিতে পারবে না ?

—সুধার এই কথার উত্তর রত্নময়ী সেদিন দিতে পারেন নি । নিজেদের অসহায়তা-অক্ষমতা তাঁর মত আর কে জানে ? চোখের জলেই অসহায় মা সুধার যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন । সায় দিয়েছিলেন তার প্রস্তাবে ।

বাসু শেষ পর্যন্ত সিভিক গার্ড-এ যোগ দিয়েছে । সুধা কিন্তু এটা পছন্দ করেনি । সে মোহিত কাকার কাছে বাসুকে নিয়ে যাবার জন্যে মাকে বলে । চরম বিপদের দিনে মোহিত ঠাকুরপোর দূরে সরে থাকা রত্নময়ীকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছিল ; তবুও যদি একটা হিল্লে হয়ে যায় —এই ভেবেই রত্নময়ী ওখানে গেলেন । মোহিতকাকার মেয়ে মীনাক্ষীকে দেখে বাসু মুগ্ধ হয়ে পড়ল । মোহিতবাবুর একমাত্র মেয়ে এই মীনাক্ষী । বিয়ের এক বৎসরের মধ্যেই তার সিঁথির সিঁদুর মুছে যায় । সে বিধবা, কিন্তু বিধবাদের মত আজ তার ছিল না । মীনাক্ষীর যুবতী শরীরের মাদকতাময় রহস্য বাসুকে উত্তেজিত ও আকুল করে তুলেছে । ক্রমশ ক্রীক রোর বাড়িটা তার কাছে হয়ে উঠেছে এক অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু । একদিন কিন্তু মীনাক্ষীর বাবার কাছে তাকে অপমানিত হতে হয় । বাসু সেই বাধা-অপমানের কথা মীনাক্ষীকে জানালে সে যা বলেছে তার মধ্যে মীনাক্ষীর অসুখী মানসিকতা, বাবার প্রতি তিক্ততা গোপন থাকে না ।

'গুরুজনদের সম্পর্কে কিছু বলতে নেই—আর আমার
কথা শোনার লোক কেই বা আছে । কিন্তু পারি
না, থাকতে পারি না । উনি বাড়িতে ঘরে দরজা
বন্ধ করে বসে মদ খাবেন । বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে
বাড়ির বাইরে রাত কাটাবেন, আনন্দ করবেন ।
আমি কি কচি খুকি, বুঝি না—বুঝতে পারি না ।

সমস্ত বুঝতে পারি আমি । কি-তু তাতে ওঁর কী আসে যায় । নিজের নেশা , অভাব , ফুর্তি কোথাও এক তিল ঘাটতি নেই । এই বয়সেও ।' মীনাক্ষী যেন এবার সাপের মত হিসহিস করছিল , তেমনই ফিসফিস স্বর , 'শুধু আমার বেলায় চোখে সয় না । বিধবা মেয়ে কিনা ।'

* * * * * * *

'সবই আমার দোষ । আমার যদি বিয়ে হতে না হতেই স্বামী মরে যায় , গলায় দড়ি দিয়ে মরতে না পারি রাতারাতি , কী করব আমি । বয়স বাঁধব , মন বাঁধব ? ছটফট করছিল যেন মীনাক্ষী , সোহাগ করে বলেছিলেন তোর আবার বিয়ে দেব মীনু । কেন ? কেন দিলেন না ? আমি না বলেছিলুম কী ? মীনাক্ষীর গলা ছাপিয়ে আবেগ উথলে পড়ল । ভিজে ভিজে স্বর । উচ্চারণে অন্য রকম এক বিকৃতি ।

বোমার ভয়ে মীনাক্ষীরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পর বাসুর চোখের সামনে পৃথিবীটা অ-ধকার হয়ে গেছে । আলেয়ার মতই মীনাক্ষী দূরে সরে গেল : ছোঁয়া দিয়েও ধরা আর দিল না ।

অফিসে অমলাদি সুধাকে খুব ভালবাসে । একই সঙ্গে তারা স্কুলে চাকরি করত । সেদিন ঠাট্টার ছলে অমলাদি সুধাকে যা বলল তার মধ্যে পরিহাসের সুর থাকলেও অ-সুখের আভাস অস্পষ্ট ছিল না । সুধাকে এবং সুচারুর অন্তরিকতা অমলার অজানা নয় , সেই প্রসঙ্গ টেনেই অমলা কথা বলছিল ।

'আমাদের তো বিয়ে-থা ঘরসংসার হবে না ।'

অমলা মুখখানা ভাবুক ভাবুক চেহারা করে বলেছিল,

'সংসার-টংসারের কথা না হয় বাদই দে–সে সব তো পরে , আগে বিয়ে , নতুন মানুষের সঙ্গে

মন জানাজানি , ভালবাসাবাসি , আমোদ-আহ্লাদ ,
মান-অভিমান, কত কিসের সুখ ; কপালে তো
সে-সব জুটবে না ভাই , তাই বরের অভাবে
একটা ব্যাচেলার ছেলের সঙ্গে খানিক বেড়িয়ে-
চেড়িয়ে মেলামেশা করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।'

বস্তুত এই সংসারের স্বার্থপর রূপটি অমলা ভালমতই চিনতে পেরেছে । সে বুঝে নিয়েছে আত্মীয়-পরিজনরা স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না । তীব্র শ্লেষের সুরেই তাই তার মন্তব্য : 'দুধ দেওয়া গরুকে কেউ সময়ে বিলিয়ে দেয় না ।'

সুচারুকে অফিসে কয়েকদিন দেখতে না পেয়ে সুধা মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠেছিল । সুচারু গেল কোথায় ? হঠাৎই সে সুধাদের বাসাতে হাজির । বেনারস গিয়েছিল ব-ধুর ফ্যামিলিকে পৌঁছে দেবার জন্যে । সুচারু দেখে এসেছে কলকাতা ছেড়ে অসংখ্য মানুষ মফস্বলে-গ্রামে চলে যাচ্ছে । এভাবে চলে যাওয়াটা সুচারুর পছন্দ নয় । সে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে :

আমার রাগ দুঃখ যাই বলুন , কিসে হয়েছে জানেন ,
এই সব দেখে । হাজার হাজার লোককে ভয়ে ভাবনায়
দুশ্চিন্তায় আধমরা করে এরা ঠেলে দিচ্ছে মফস্বলে ।
হাওড়া শিয়ালদা , মায় হাওড়া ময়দান , পাতিপুকুর
যেখানে যান লোকে জিনিসে , মালে ময়লায় বস্তিতে
থুতুতে একাকার । মাছ-গাদা হয়ে ট্রেনে লোক
চলেছে ? ট্রেনে চড়তে না পারলে রাতের পর রাত
স্টেশনে পড়ে আছে । কলকাতার ট্যাক্সিঅলা , ঘোড়ার
গাড়িঅলা , ঠেলাঅলারা এখন সব এক একজন লাঠ--
বেলাট । স্টেশনের কুলি পর্যন্ত । বেকায়দায় পেয়ে
গলা টিপে রোজকার করে নিচ্ছে ।

বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে মানুষ জানের ভয়ে পালিয়ে যাবার যে দৃশ্য সুচারুর চোখে ভাসছিল – তা প্রকৃতই মর্মান্তিক ।

সুচারু যেন দেখতে পাচ্ছিল, বাক্স বিছানা হাতা-খুন্তি
তোলা উনুন ঝাঁটা শিলনোড়া—মানুষে-মালে বোঝাই
হয়ে ট্যাকসি, লরি, ছ্যাকরা গাড়ি, ঠেলা চলেছে রাস্তা
দিয়ে, সারি সারি। ভয়ে—ভাবনায় ফ্যাকাশে উদভ্রান্ত
মুখ সব। বাচ্চাগুলো নির্বোধের মতন তাকাচ্ছে
আর কাঁদছে, মেয়েরা লজ্জাশরম চুলোয় দিয়ে
মাছ-গাদা ট্রেনের কামরায় উঠছে, বাসবসন ছেঁড়ে ছিঁড়ুক;
কার গায়ে টলল, কার কোলে বসল কে খেয়াল করেছে।
এর বউ হারায় তো ওর বোন। বাচ্চাগুলোর সর্দিগর্মি,
বমি। বুড়িটুড়ি দমবন্ধ হয়ে মরো মরো অবস্থা।
পুরুষগুলো ছুটছে, ঘুষ দিচ্ছে, ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে,
দেনা করছে, ট্যাক্সিঅলার হাতে পায়ে ধরেছে, মাথা
ঘুঁড়ছে কুলির পায়ে। আগে যে পাঁচ -এখন তা কমপক্ষেও
পঁচিশ।

যুদ্ধের করাল ছায়া আস্তে আস্তে পুরো শহরটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এমন প্রাণচঞ্চল শহরটা আজ একেবারেই নিথর নির্বাক। কিছু মানুষ - যাদের হাত পা বাঁধা, অন্য উপায় যাদের নাই, তারাই শুধুমাত্র পড়ে রয়েছে। এখানে 'এখন শুধু ভয়, অনিশ্চয়তা। আতঙ্ক আর অস্বস্তি'। কলকাতা এখন মৃত্যুর। শুধু অন্ধকারের। প্রতিটি মানুষই আজ নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন, আশঙ্কায় ম্রিয়মান। অফিস, দোকান, বাড়ি, সর্বত্রই এক আলোচনা ....যুদ্ধ। সেদিন সুচারুদের অফিসেও এই নিয়ে জোর আলোচনা - তর্কবিতর্ক চলছিল। ললিতবাবু জাপানের অন্ধ সমর্থক। সুচারুর কিন্তু জাপানের ভূমিকা একেবারেই পছন্দ নয়। সুচারু ললিতবাবু জাপ-প্রীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে।

ললিতবাবু পালটা জবাব দেন, 'তোমার ইংরেজই
বা কী এমন সভ্য হে, সুচারু? এমন কী মহামানবের
দল? দেশটাকে তো আমাদের শুষে শুষে ছিবড়ে করে
দিয়েছে। আমি বলব ওরা পশু, পশুর চেয়ে অধম—

বর্বর-শ্রেষ্ঠ । এই স্লেভারি থেকে আমাদের মুক্তি চাই । উই মাস্ট ।'

'জাপান কি আপনাদের মুক্তি দেবে ?' সুচারু বিদ্রূপ করে । 'নিশ্চয় দেবে । ওরা এশিয়া ফর এশিয়ান্স, এই কজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে ।' ললিতবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন । 'আবার সেই নির্বোধের মতন কথা । দেখেও দেখবে না, জেনেও জানবে না । মাঞ্চুরিয়াকে কোনো স্বাধীনতা দিয়েছে জাপান ! চীনের ওপর তার এ শকুনি দৃষ্টি কেন ? কিসের জন্যে লড়ছে । স্বাধীনতা দিতে—? টু লিবারেট চায়না ?' সুচারু ধৈর্য হারায় । গলার সুর চড়ে ওঠে । কথায় যত ঝাঁঝ তত খোঁচা ।

আলোচনা থেমে যাবার পর নিজের চেয়ারে বসেও সুচারুর রাগ কমছিল না । সে ভেবে পায়না মানুষজন জাপানকে নিয়ে এত লাফালাফি করছে কেন ? অনেকেই হয়তো ভাবছে জাপান যুদ্ধে জিতলে ভারত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে যাবে । অদ্ভুত প্রত্যাশা । সুচারু না হেসে পারে না ।

সুচারু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবে । চাকরি ছাড়ার চিঠিটাও অফিসে জমা দিয়ে দিল সে । সবাই তাকে ঘিরে ধরে । কেউ দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করে — আবার কেউ জানায় সুচারু নিদারুণ ভুল করছে । এই অফিসে সুচারু আর আসবে না —ভাবতে গিয়ে সুধার বুকটা অপর্যাপ্ত ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে ওঠে । অমলা সুধার দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারে । তার অনুযোগ— সুধা সুচারুকে যুদ্ধে যেতে কেন বাধা দিল না । প্রত্যুত্তরে সুধা যা বলেছে তাতে তার ব্যথা এবং অভিমান গোপন থাকে না ।

সুচারু সুধাদের বাড়িতে এসেছে ; উদ্দেশ্য কলকাতা ছাড়ার আগে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, বিদায় চেয়ে নেওয়া । এ ছাড়া আলাদা করে সুধাকে কিছু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন । কেরানী গিরির বাইরেও একটা বিশাল জগৎ আছে —এ কথা সে বলবে ; কি-তু নিজেকেই শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করেনি সুচারু, সুধাকে নিয়েও সে

ভেবেছে অনেক কিছু। সুচারু ভেবে দেখেছে সংসারের যাঁতাকলে সুধা ভয়ঙ্করভাবেই আটকা পড়ে গেছে, এর থেকে তার মুক্তি নাই, এই মুহূর্তে অবশ্য অন্য কিছু ঘটাতে গেলে আরও সর্বনাশ।

> নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া ছাড়া নেবার কিছু নেই সুধার। তার চিতা ধরানো হয়ে গেছে এই অভাব অনটন দাও-দাও সংসারের শ্মশানে। সুধাকে রোজগার করে টাকা আনতে হবে বাড়ি ভাড়া দিতে, চাল কিনতে, উনুন ধরাবার কয়লা জোগাড় করতে, পরনের কাপড় জোটাতে। এবং নিজেকে ভীষণ থেকে ভীষণতর বঞ্চনার কাছে মাথা নুইয়ে আক্রোশে অভিমানে ব্যর্থতায় পুড়ে পুড়ে মরতে হবে। এ-ছাড়া অন্য পথ নেই। লক্ষটা ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য এখানে এক হয়ে আছে। তবু যদি জোর করে জীবনে নতুন কোনো মোড় ঘোরাতে যায় সুধা, তার ফল ভাল হবে না। তার ভাঙা সংসার আরও ভাঙবে; হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যাবে। সুধা অতটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারবে না। হওয়া উচিত হবে না।

সুধাকে সুচারু জানিয়েছে সে নিজস্ব উন্নতির জন্যে যুদ্ধে যাচ্ছে না। যাচ্ছে ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মধ্যেও জীবনের কিছু অসাধারণ ছবি আঁকার জন্যে; যুদ্ধ তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। বিস্মিত সুধাকে সুচারু জানিয়েছে আমাদের চেনাজানা চৌহদ্দির বাইরেও একটা জগৎ আছে। 'যুদ্ধ তেমনি এক জগৎ; রিয়ালিটিকে সেখানে খুব স্পষ্ট করে চেনা যায়।'

> সুধা অন্যমনস্ক গলায় হঠাৎ বলল, 'এই মারামারি-কাটাকাটি, মারাধরা আপনি ভালবাসেন? এর ছবি আঁকতে চান?' 'না।' সুচারু মাথা নাড়ল, 'মারামারি-কাটাকাটি আমি ভালবাসি না। যুদ্ধ আমি চাই না। কিছু আমার তোমার চাওয়া না-চাওয়ায় কি যুদ্ধ আটকে থাকছে।'

* * * * *

'আরও কথা কী জান, ঘরদোর খৈতখামার
পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দুধের শিশু, বাড়ির
মেয়ে-বউ মাঠঘাট ভেঙে তাড়া খাওয়া গরু-
ছাগলের মতন ঘর বাড়ি ফেলে পালাচ্ছে,
মরছে—এই সব মর্মান্তিক বীভৎস দৃশ্যই যদি
যুদ্ধের একমাত্র দৃশ্য হত আমার সেখানে যাবার
দরকার ছিল না। আমার মনে হয় এ-বাদেও
আরও কিছু আছে।

* * * * *

যুদ্ধের বীভৎস রিক্ততা আর নিঃস্বতার মধ্যে
কোথাও নিশ্চয় জীবনের সেই ছবি আছে।
কদাচিৎ হয়ত তা ফুটে ওঠে। কিন্তু আমার
কাছে তার অশেষ মূল্য।'

সুচারু সুধার কাছে বিদায় চায়। বলে-সে আবার ফিরে আসবে, এসে ঠিক সুধাকে খুঁজে নেবে। সুধা হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সুচারুর হাত নিজের বুকে টেনে দু'হাতের মধ্যে শক্ত করে চেপে থাকে। তার মুখে কথা নাই। স্পর্শের অনুভূতি, নির্ভরতার আশ্বাস আর আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ ব্যথা—সব মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। তবু শেষ পর্যন্ত সুধা বলে ওঠে: 'যদি বেঁচে থাকি আমি থাকব—। তুমি এসো।'

অন্ধকারের বুকে এক টুকরো আলো জ্বেলে দিয়ে সুধা বিদায় দেয় সুচারুকে। সুচারু চলে যাবার পরেও দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ; মনে মনে ভাবে সুচারু বোধ হয় আবার ফিরে আসবে। ফিরে আসবে 'ওই ঝড় বৃষ্টি আর অন্ধকার থেকে।'

না, এল না সুচারু। আর আসবে না।
এই ছোট ঘর, একটু আলো—তার বেশি

আর কী আছে এখানে। সুচারু যে
আরও বড় কিছু চায়, অনেক বেশি
আলো। বড় ছোট এই ঘর—বড় ছোট।
সুধা আস্তে, আস্তে, ফিরে চলল।

'ছোটমন' (১৩৬৪) এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের ঘটনাকাল জুলাই ১৯৪২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪৩। বাংলার সমাজেতিহাসে এই পর্বটি বিভিন্ন দিক থেকেই সবিশেষ গুরুত্ববাহী। এই সময়সীমার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়েছিল ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তা ছাড়া দুটি মারাত্মক ঘটনা বাংলার সামাজিক কাঠামোকে প্রায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (৪২), এবং ভয়ঙ্কর পঞ্চাশের মন্বন্তর (৪৩)। আলোচ্য পর্বটির মধ্যে গান্ধী প্রসঙ্গের অবতারণা বারবার ঘটেছে। গান্ধীবাদের প্রায়োগিক দিকটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্যুতির প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। আকুমারিকা হিমাচল ভারতবর্ষের বুকে গান্ধী নামটি যখন মহিমার উত্তুঙ্গ শিখরে, তখনও লেখক অতিশয় সংযমের সঙ্গে গান্ধীবাদ রূপায়ণের পথে যে তমসাবৃত দিকটিকে চিহ্নিত করেছেন — তা নিরপেক্ষ মূল্যায়নের পরিচয়বাহী।

যুদ্ধ, বিপ্লব-আন্দোলন, বন্যা, মন্বন্তর, গান্ধীবাদ, কমিউনিজম — প্রভৃতির মধ্যেও কি-তু কিছু মানব-মানবীর অন্তরঙ্গ জীবন—তাদের আশা ও হতাশা—আবেগ এবং যন্ত্রণা ঢাকা পড়ে যায়নি। সঙ্ঘাতক্ষুব্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রচন্ড অ-সুখের যন্ত্রণা বুকে নিয়েও যারা বাঁচার তাগিদে অবিচল, —সেই জীবনপুঞ্জের বিস্ময়কে বিধৃত করে ঔপন্যাসিক সময়ের সাথে সাথে মানুষের যাযাবরা জীবনের দাবিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি স্রষ্টার দায়িত্ব সচেতনার প্রতি আমাদের মনোযোগকে আকর্ষিত করে।

প্রথম পর্বের মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছিল চন্দ্রকান্ত, রত্নময়ী, সুধা, বাসু, আরতি, মহিম, মীনাক্ষী, সুচারু, —প্রভৃতি চরিত্রের কথা। সুধার বুকে কান্নার অশান্ত আবেগ জাগিয়ে সুচারুর বিদায় গ্রহণের ভিতর দিয়ে শেষ হয়েছিল

প্রথম পর্ব । দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আমরা আরও কিছু নবাগত এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সন্ধান পাই । বিশেষভাবে নাম করতে হয় গিরিজাপতি , উমা এবং নিখিলের । গিরিজাপতি নতুন ভাড়াটে , সুধাদের নিচের তলার বাসিন্দা । নিখিল ও উমা তার ভাইপো-ভাইঝি । মানুষটি প্রকৃতই ভদ্র । তিনি 'নিজের কথা' লেখেন ঠিকই , কিন্তু তার মধ্যে নিজস্ব জীবন বেশির ভাগ সময়েই অনুক্ত থাকে । তা ছাড়া অতীতের একটা বিরাট অধ্যায়কেই তিনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন । যুদ্ধের করাল সঙ্কটের মধ্যে গান্ধী-বাদ–কমিউনিজম– প্রভৃতির মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রভূমিতে গিরিজাপতি এবং নিখিলের ভূমিকা বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ । শারীরিক ত্রুটিযুক্ত উমার বেদনাহত মানসিকতা এই পর্বের পরিবেশকে আর্দ্র করে তুলেছে । লোকজন উমাকে দেখলে চমকে ওঠে , তার দৈহিক বিকৃতি নিয়ে মজা পায়–উপহাস করে । কিন্তু উমাকে দেখে আমরা কী-করে ভুলে যাব যে তারও একটি অন্তর আছে এবং সেই নিটোল অন্তরের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভূত হয়ে চলেছে স্বাভাবিক জীবনের উষ্ণ স্পন্দন । আলোচ্য পর্বের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় রত্নময়ীরা বেঁচে আছে ঠিকই ––তবে অসহ্য কষ্টের মধ্যে , যন্ত্রণার প্রদাহকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে । পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিবেশ এই সংসারে অন্তর্হিত হয়েছে । প্রত্যেকেই হয়ে পড়েছে প্রতিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন । সুধা–বাসু - আরতি ,––প্রত্যেকেই অবস্থান করতে চেয়েছে পরস্পরের মধ্যে একটা বিশাল দূরত্বকে জিইয়ে রেখে । স্বতন্ত্র আজ তারা : ভাবনায় এবং আচরণে । ক্ষয়িষ্ণুতার নাগপাশে সুধারা আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা পড়ে গেছে । এই পর্বে বাসুর অসংযত এবং উদ্ধত আচরণ ব্যাপকতার মাত্রা নিয়েছে । প্রথম পর্বের মধ্যেই ইঙ্গিত মিলেছিল আরতি চন্দ্রকান্ত এবং রত্নময়ীর সন্তান নয় । দ্বিতীয় পর্বের প্রায় অন্তিমে নাটকীয় উপায়েই এই খবর আরতিকে জানানো হয়েছে । মৃত পিতার পারলৌকিক কার্যের জন্যেই এই পরিচিতির প্রয়োগ । সবিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করি এতকাল ধরে যাঁদের বাবা-মা , দাদা-দিদি , বলে জেনে এসেছে ; মুহূর্তকালের মধ্যেই সেই চেনামুখগুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আরতি । এই বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র সাম্পর্কিক নয় –– আত্মিকও । 'আমাদের বাবা' শব্দ দুটি একদিন উচ্চারিত হত অপরিহার্যতার দাবি নিয়েই , কিন্তু চন্দ্রকান্তের উদ্দেশ্যে বাসুর 'আমার বাবা'–এই উচ্চারণ আরতিকে বেদনায় নিথর করে দিয়েছে । রক্তের সম্পর্ক না হয়েও যা ছিল রক্তের চেয়ে দামি , আজ সেখানে তুমুল সঙ্কট ।

বলাইবাবুদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে হিসেবে গিরিজাপতিদের উপস্থিতিতে সুধারা অস্বস্তিবোধ করেছে। নতুন ভাড়াটের প্রতি তাদের যে বিরক্তি বা ঈর্ষা আছে সে রকম কিছু নয়, কিন্তু এতদিন তাদের দৈন্য-চিন্তা-মালিন্য অপরের কাছে প্রকাশ পাবার সুযোগ ছিল না; যেটা এবার ভালমতই ঘটবে। সুধা পিছনের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া শান্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করে। তখন চন্দ্রকান্ত জীবিত। কিন্তু তারপরেই সব কিছুর সমাপ্তি।

বাবা মারা গেলেন – সে সব শান্ত সুন্দর
দিনও শেষ হল। তারপরই যে এবাড়িতে
মায়েতে মেয়েতে, ভাইবোনে ঝগড়াঝাটি
লাঠালাঠি বেধে গেছে তা নয়। অনেক
দিন পর্যন্ত আগের জের বয়ে আসছিল।
তাই মনে হত। কিন্তু আসলে তা নয়,
একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। যেন আগের
স্রোতের সেই জল ঘাট থেকে ঘাটে যেতে
রঙ বদলে ঘোলা হয়ে আসছিল।

সুধা ভালভাবেই বুঝতে পারছিল এখন তারা সকলেই সকলের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ কাউকে মানতে চাইছে না। স্বীকার করতেও। যে নম্যতা শৈশবের দিনগুলিকে রম্য করে তুলেছিল, সম্বন্ধের অস্তিত্বকে করে তুলেছিল মধুস্বাদী, আজ সেখানে নিদারুণ শৈথিল্য। রত্নময়ীর সঙ্গেই সুধার মানসিক ব্যবধান আজকে কত প্রকট। শুধুমাত্র বাসুর ঔদ্ধত্যই নয় —আরতিও আজকাল আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, সেও আর চুপ করে থাকে না।

আজকাল ওদের সংসারের এই তো চেহারা।
চারটে মানুষ চাররকমের। একই ঘরের চার
বাসিন্দে যেন। কিন্তু এক জায়গায় এই চারটি
মানুষের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র থাকতে পারে নি,
এক হয়ে গেছে। সেটা কি? অশান্তি।
হ্যাঁ, তারা কেউই শান্তিতে নেই; তাদের
সুখ বলে কিছু থাকছে না। ওরা শুধু অভাব
অনটন, অশান্তি আর কষ্ট নিয়ে বেঁচে আছে।

যে নিবিড় সম্পর্কের নৈকট্য অনায়াসেই একজনকে অন্যজনের কাছে উন্মোচিত করে দিতে পারত, তা যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে — সে সম্বন্ধে সুধার মনে আজ আর কোনও সংশয় নাই। সুধা বেশ বুঝতে পারে সে এক সমবেদনাহীন স্বার্থপর ইতর জগতে আটকে পড়েছে। এখানে সে তিল তিল করে নিঃশেষিত হবে, আর্তনাদ করবে, —তবু তার জন্যে কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। সবাই তাকে নিংড়ে নিতে চায়। দুঃসহ আর্তিতে গুমরে উঠছে সুধা। এই জমাট অন্ধকারেও একটি মুখ খুব বেশি করে মনে পড়ে তার। সে মুখ সুচারুর।

> একজন আছে। ঠিক এমন সময়, এই রকম আকুলতার মধ্যে তাকে বড় বেশি, খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। সে যেন সুধার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকে, সুধার কান্না, সুধার দুঃখ, তার ব্যাকুলতা দেখলেই নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে এ-মানুষকে ছোঁয়া যায় না, কি-তু মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ এবং একান্ত করে আর কাউকে টেনে নেওয়াও যায় না।

এই পর্বে আমরা লক্ষ্য করি বাসুর বেপরোয়া আচরণ চরম সীমায় পৌঁচেছে। সুচারু যুদ্ধে যাবার আগে তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল, কি-তু বাসুর সেটা পছন্দ নয়। সে এখন যে কোনও উপায়ে কিছু রোজগার করে নেবার ধান্দাতে ব্যস্ত।

> সিভিক গার্ডটা ছেড়ে দিয়ে অনেক কিছু বেহাত হয়ে গেছে। চায়ের দোকান, পানের দোকান, লন্ড্রি কোনো শালাই আর খাতির করে না। বেলেঘাটার সেই শিশিবোতল ধোওয়া কাজটাও যদি না ছাড়ত বাসু —তবু চলত একরকম। আজকাল একেবারে পাইসলেস অবস্থা। পালিতদের দোকানের খানিকটা তার লোপাট করেছিল বাসু, গাড়ি থেকে সেদিন, খুব পাতলা তার, তা প্রায় সের পাঁচেক ওজন। একটু তফাতে

গিয়ে বেড়ে দিয়েছিল । ফল পাওয়া যায় নি ।

বাসুর কাজকর্ম দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না চন্দ্রকান্তের মত মানুষের ছেলে হিসাবে যে মূল্যবোধের উত্তরসূরিতা তার কাছে প্রত্যাশিত, তার ছিঁটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নাই । যৌবনোদ্ভাসিত এই সাবলীল তরুণটি আজ চরম অসুস্থতার শিকার । নৈতিকতাবর্জিত পিচ্ছিলতার মধ্যে তার অনায়াস গতায়াত ।

গিরিজাপতির লেখার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে রূপটি বিধৃত --সেখানে বারবার প্রশ্নাবলি মাথা তুলেছে । তাঁর ধারণা গান্ধী সমগ্র ভারতবাসীর অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষাবধি তিনিও তাঁর 'স্বাভাবিক বিশ্বাসে' অটুট থাকতে পারেননি । তাঁর মনও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাসের শিকার হয়েছে; অথচ অবিশ্বাস এবং অহিংসা তো নিশ্চিতরূপেই পরস্পর বিরোধী । গান্ধী একদিন বলেছিলেন বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দেবে কথা দিলে অপেক্ষা করতে আপত্তি নাই, কিন্তু ভারি অদ্ভুত লাগে, বেমানান মনে হয় --যখন সেই গান্ধীজীই অধৈর্য নিয়ে বলে ওঠেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় ।

> ".....যে দেশ দুশো বছর ধরে পরাধীন আরও দশ বিশ বছর পরাধীন থাকলে তার কৃষ্ঠির আকাশ পাতাল পার্থক্য হবে না । কিন্তু দেশের দুশো বছরের তপস্যায় যদি সত্যিই এক গান্ধীর আবির্ভব হয়ে থাকে, তবে সে-দেশের দীর্ঘ তপস্যার ফলটিকে কীটমুক্ত থাকতেই হবে । না হলে একটি কীট থেকে শত কীট, সহস্র অন্যায় জন্ম নেবে । শনির পক্ষে সামান্য একটি ছিদ্রই যথেষ্ট; রোগ-বীজাণুর মতন সে দ্রুত দুর-ভাবে বাড়ে ।"

কংগ্রেসের অহিংস গণআন্দোলন ব্যাপারটাও গিরিজাপতির বোধগম্য হয় না । তাঁর মনে হয়েছে শেষাবধি হিংসাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি --হবেও না । কংগ্রেসী নেতৃত্ব যাকে পাপ বলে মনে করে সেই 'গোপনচারী হিংসা' ফণা তুলবেই । মুখে

সঙ্ঘর্ষ চাই না -সন্ত্রাস চাই না বলে চিৎকার করলেও দ্রুত পদক্ষেপই তাকে সুযোগ করে দেবার জন্যে দায়ী ।

বোমার ভয়ে যে সকল মানুষ পালিয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে । না এসে উপায়ও নাই ।

সেখানেও জীবন দুঃসহ । চালের দাম আগুন ,
চিনি নেই , নুন প্রায়ই ফুরোয় , কেরোসিন
তেল জোটাতে গলদঘর্ম , অসুখে বিসুখে ওষুধ
জোটে না , সাপের কামড়ে ছেলে বউ মরে ,
ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙে যায় , তার ওপর
এই নতুন বিপদ—ট্রেনের লাইন ওঠাওঠি ,
স্টেশন পোড়ানো , ডাকঘর লুঠ । কোন
ভরসা আর বাইরে ? ট্রামের লাইন উপড়ে
ফেললে , ডাকঘর পোড়ালে , কলকাতায় যে
থাকল আর মধুপুর দেওঘর সাঁইথিয়া কিংবা
আর কোথাও সংসারের আর যারা থাকল তাদের
মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান ।

শুধুমাত্র কলকাতা নয় , সমগ্র বাংলাতে গণ্ডগোল ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । ঢাকা , ময়মনসিংহ , বালুরঘাট , শিলিগুড়ি থেকে বর্ধমান , বোলপুর , বাঁকুড়া—কোথাও বাকি নাই । বাংলা , বিহার , আমেদাবাদ , বোম্বাই , মাদ্রাজ , নাগপুর , এলাহাবাদ—সর্বত্রই হাঙ্গামার আগুন । থানা পোড়ানো , রেল লাইন উপড়ে ফেলা , তার ছিঁড়ে দেয়া প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে গিরিজাপতি প্রত্যক্ষ করেন মানুষের পরমায়ু লুঠের এক অপ্রতিরোধনীয় উন্মত্ততা । ১৬ অকটোবর সপ্তমী পুজোর রাতে বিধ্বংসী সাইক্লোনের বলি হয়েছে অগণিত মানুষ । সরকারি তরফ থেকে প্রকৃত ত্রাণের কোনও খবর নাই , উল্টে প্রকৃত তথ্যকে চেপে দেবার চেষ্টা হয়েছে । গিরিজাপতি ভেবে পান না এ কেমন প্রজাশাসন ।

ইদানীংকার সরকারী খবর থেকে অনুমান করা যাচ্ছে ,
দশ পনেরো হাজার মানুষ মরেছে শুধু মেদিনীপুরেই ;

বেসরকারী হিসেবে তিনগুণ প্রায় । চব্বিশ পরগণায় হাজার দুই । আট-দশ লক্ষ বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন , পনেরো বিশ লক্ষ লোক গৃহহীন । ঘাটাল , তমলুক , কাঁথিতেই শুধু দেড় লক্ষ গরু মরেছে । ..... এবং সবই মোটামুটি অনুমান ; পরে আস্তে আস্তে আরও কিছু প্রকাশ পাবে । রিলিফের লোকজনের কাছে ।

আমরা দেখেছি গিরিজাপতি কংগ্রেসি নীতি-গান্ধীবাদ ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিচ্যুতি প্রসঙ্গে নিজস্ব মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তা সত্ত্বেও বিপ্লবী বন্ধু সতীশের আবেগদৃপ্ত বক্তব্য তাকেও প্রভাবিত করেছে । বাংলাদেশের মাটিতে নিজেদের সরকার --সতীশের কথাতে চমকে উঠেছেন তিনি । তমলুকের কিছু আপনরাঙা দিনের যে স্বপ্ন সতীশের চোখে জড়িয়েছিল --গিরিজাপতি তাকেও অনুভব করতে পারছিলেন । গিরিজাপতির উদ্দেশ্যে সতীশের বক্তব্যে যুক্তি এবং আবেগ দুই-ই ছিল ।

'গান্ধী-গান্ধী-গান্ধী । গিরিজা তুমি গান্ধী ছাড়া কি কিছু জানো না ? কংগ্রেস গান্ধীর জমিদারি নয় । কংগ্রেস তাঁর একার নয় । আমাদের --আমাদের সকলের । সকলের দেশে যা হচ্ছে – যা করছি আমরা --ভাল বুঝেই করছি । গান্ধীতে কী আসে যায় । আমাদের নিজের ভাববার করবার অধিকার কেউ নিতে পারে না । .....না , আমরা কোনো পাপ করছি না , অনুশোচনাও করব না কোনো দিন ।'

কলকাতা ছেড়ে দিয়ে মানুষজন আবার পালাতে শুরু করে দিয়েছে । এবারে আর গুজব বা নিছক আতঙ্ক নয় । জাপানী প্লেন ঝাঁক বেঁধে এসে বোমা ফেলে যাচ্ছে । ডালহৌসি , মিশন রো , হাতিবাগান বাজার , ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিল, খিদিরপুর ডক—ইত্যাদির ওপর বোমা পড়েছে ।

সাতে-পাঁচে , লড়াই-যুদ্ধে কোনো কিছুর মধ্যে যারা নেই, সাধারণ মানুষ - বাজারের ফড়ে , তরিতরকারি বেচা নিরীহ দোকানদার , কুলি মুটে মজুর —তাদের মাথাও নিরাপদ নেই । বোমার ঘায়ে তারাও মরল । বাজারের চাল উড়ে গেল—শাকসব্জির নরি ঘাড় মুখ গুঁজে কোথায় ছিটকে গেল— রাশ রাশ হাত পা ধড় কাটা মানুষের রক্ত-মাংস হাড়ে স্তূপীকৃত হল পথ । অথচ চিহ্নটুকু পর্যন্ত রাতারাতি কোথায় যে মিলিয়ে গেল—কেউ জানল না ! এমন সর্বনাশ , আতঙ্ক মাথায় নিয়ে মানুষ কি থাকতে পারে ?

পাঁচ দিনের বোমায় হাজার পনেরো মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়েছে । তারপর শুধু পালাও-পালাও রব । আগের বছরের মতই কলকাতা ছেড়ে যেতে হাজার হাজার মানুষ থিক থিক করছে স্টেশনে ।

কামরায় ভেতরে জায়গা নেই তিলধারনের —পা-দানিতে মানুষ ঝুলছে । মাথার ওপর চড়ে বসেছে । আঁকড়ে ধরে আছে কিছু একটা । কার সাধ্য তাদের নামাবে । নামাতে গেলে হাউমাউ করে কাঁদে , পায়ের তলায় আছাড়ি-পিছাড়ি খায় । ন'মাসের পোয়াতি বউকে বাংকের ওপর একপাশে ঠেলে পুঁটলির মত ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে —পাংশু মুখ অসহ যন্ত্রণা নিয়ে বসে আছে তবু । থুড় থুড়ে বুড়ি —মন্দ জোয়ান সব ঠাসাঠাসি হয়ে রেল-কামরার পায়খানার মধ্যে ঠাসা । বেঞ্চির তলায় মধু লোভী মাছির মতন এঁটে রয়েছে একরাশ মানুষ । না পারে নড়তে —না পারে হাত ছড়াতে ।

.....তারই মধ্যে থুতু , বমি , বিড়ির ধোঁয়া , মূত্র । কেউ মূর্ছা যাচ্ছে , যক্ষ্মা রুগী কাশছে একটানা —— ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে ছেলে বউ হারানো মন্দ জোয়ান ।

শুধুমাত্র বিধ্বংসী সাইক্লোন এবং জাপানী বোমাই নয়, পরপরই সমগ্র বাংলার বুকে শকুনের ডানায় ভর করে নেমে এসেছে মন্বন্তর। কান্নার রোল উঠেছে বাংলার ঘরে-ঘরে। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। পেটে তাদের খিদের দুঃসহ জ্বালা। একমুটো ভাত--একটু ফেন – এই প্রত্যাশা বুকে নিয়েই তারা আজ শহররাভিমুখী। এদের দলে চাষি, ভাগচাষি, কামার, কুমোর, নাপিত; ধোপা; জনমজুর, জেলে, তাঁতি, ডোম, বাউরি—প্রায় সকলেই ছিল। না এসে কোনও উপায় ছিল না। কতদিন আর উপোস করা যায়?

একেই বলে ক্ষুধা। এক আধ বেলার একাদশী অমাবস্যার জ্বরজ্বালায় উপবাস নয়, সকাল সন্ধ্যে মাসের পর মাস অভুক্ত থাকা। কচু পাতার শালুক ভাঁটার হড়হড়ানি খেয়ে ক্ষুধাকে শান্ত করা যায় না, ব্যাঙের ছাতা যুদকণা দিয়ে গতরকে রাখা যায় না। ভাত চাই –পেট ভরা ভাত; ওজন না থাক—অন্তত কলাই ডাল আর নুন আর সোয়াদের জন্য কাঁচা লঙ্কা। ভাত কোথায়? পাঁচ ছ'টাকা মণের চাল আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ –, কোথাও কোথাও চল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে। দিন আয় যার চার গন্ডা পয়সা—কিম্বা আট গন্ডা—মা, মাগ, ট্যা - ভ্যাঁ নিয়ে কমপক্ষে পাঁচ সাত জন কার পুষ্যি-আস্যি—তার কি হবে একসের আধসের চালে।

* * * * * আজ আর কিছু নেই — শুধু পেট ছাড়া, পুঁজি ছাড়া। আর আশাও বুঝি একটু আছে। শহরে গেলে দু-মুঠো হয়তো জুটবে। গতর দেব, শক্তি সামর্থ্যে যা কুলোয় তারও বেশি খাটতে পারি। তার বদলে দুটো ভাত দাও। যেমন তেমন আসি-বাসি-গন্ধ পচা ফেলানো ছড়ানো এঁটো কাঁটা দুটি ভাত দাও।

সমস্যা এবং সঙ্কটে মানুষজনের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, তখন এই কলকাতা শহরের বুকেই একটি বাড়ির কয়েকজন মানুষ কোনওরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে নিজেদের

এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শুধু পেটের জ্বালাই নয়, মনের মধ্যেও দাহ কিছু কম নয়। মূলত সুধাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি মোড় নিয়েছে নতুন দিকে। সুধা এখন চন্দ্র সাহেবের অফিসে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তার চাকরিটা এমন --একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে না গেলেই নয়। রত্নময়ী কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝতে চাইছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল সুধার এই ভাল কাপড় -জামা-জুতো অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মত মানুষদের পক্ষে এটা মানায় না। এই ব্যাপারেই সেদিন সুধার সঙ্গে রত্নময়ীর প্রচন্ড চেঁচামেচি হয়ে গেল। রত্নময়ী যা নয় তাই বললেন। সুধাও থেমে থাকেনি। শোষিত হবার যে যন্ত্রণা-প্রকারান্তরে তারই বহির্প্রকাশ ঘটল সেদিন। রত্নময়ী এবং সুধার এই কলহ আরও দু'জনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল : বাসু ও উমা। রত্নময়ী রাগ করে না খেয়ে ছিলেন সারাদিন। উমা বাসুকে এই কথা জানালেও—বাসু কর্ণপাত করল না। তার এখন এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? মা উপোস করে মরছে; ছেলে প্যারাডাইসে লীলা চিটনিসের জন্যে আকুল। বাসুর এই জঘন্য মানসিকতায় আচমকাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে উমা। তীব্র ভর্ৎসনা করে বাসুকে। এর পর বাসু যা করল তা বাসু ছাড়া অন্য যে কোনওজনের কাছেই বে-মানান।

> উমার হাত চেপে ধরল খপ্ করে শক্ত মুঠোয়।
> 'খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং বাত হচ্ছে – তোমার
> এই মেয়েছেলেদের মতন ন্যালা-ক্যাবলা ভাই
> পেয়েছ নাকি আমায় –এক থাপ্পড়ে বাপের নাম
> ভুলিয়ে দেব, আর একটা যদি কথা বল।' উমার
> হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল বাসু, যেন একটু
> মুচড়ে দিল। একটু থেমে যেন উমার মুখের দিকে
> চেয়ে কদর্য গলায় বিদ্রূপ করল, 'উ-হু : – খুব
> কর্তামি ফলাতে এসেছে --কোথাকার কে আমার লাট
> রে। মেয়েছেলের মুখে লম্বা লম্বা বাত—।' উমার
> হাত ছেড়ে দিল বাসু, 'আমার মা খায়—না খায় আমরা

বুঝব , তোমার কী —ছেলের বউ নাকি তুমি ?....
তাও যদি একটু ভদ্দরলোকের মতন চেহারা হত !

উমা জানে সে কুৎসিত । মানুষজন তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে । কিন্তু বাসু আজ তাকে যে-ভাবে অপমান করল...উমার চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বাঁধছিল । উমা কী অন্যায় কিছু করেছিল ? মাসিমা তাকে কত স্নেহ করেন , তাঁর জন্যে সে কি সামান্যতম কিছুও করতে পারে না । উমার বুকের ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা ।

জ্বালা সুধার বুকের মধ্যেও কিছু কম নয় । সংসারের চরম ইতরামো স্বার্থপরতা আজ তার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারটাকে একাই সে বয়ে এসেছে এতদিন । স্কুলে চাকরি করেছে , টিউশন করেছে দু'বেলা । যা পেয়েছে — সব এনে তুলে দিয়েছে মায়ের হাতে । তবেই না দু'বেলা পেটের জ্বালা মিটেছে , ভাড়ার টাকা মেটানো গেছে । নিজস্ব সখ – আহ্লাদের চিন্তা সুধা কোনোদিন করেনি । আর সেই মায়ের মুখে এত কটু কথা উচ্চারিত হল । সুধা ভাবছিল সে কীভাবে সংসারের প্রয়োজনে ছিবড়েতে পরিণত হয়েছে । নিজের বলতে তার কিছু রইল আর ?

কিছু না , কিছুই নয় । সুখ শান্তি আরাম
আয়াস ইচ্ছে মন—সব—তার সবই এই সংসার
একটা নিষ্ঠুর পাওনাদারের মতন কেড়ে নিয়েছে ;
নিচ্ছে এখনও । নিজের জন্যে একটি বিন্দুও কিছু
রাখতে দেবে না । এই বাড়ির মেয়ে তুমি—তোমার
বিধবা মা আছে , বোন আছে ভাই আছে —
কাজেই আর কথা কিসের —সারা দিন তোমার
সবটুকু রক্ত জল করে এদের খাওয়াও পরাও ,
বাড়ির ভাড়া জোগাও , যার যা চাহিদা মেটাও ।
শুধু মিটিয়ে যাও । এদের মুখ রাক্ষসের হাঁ নিয়ে
আছে , হাতগুলো দাও দাও করছে , চোখগুলো সব
সময় লোভে হিংসায় ঈর্ষায় চকচক করছে । এরা রাক্ষস,
এরা পশু , এরা ভিখিরি, ইতর, স্বার্থপর , আত্মসুখী ।

সুধার মনের আয়নায় তার মরে যাওয়া হয়ে যাওয়া শরীরের ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । সে জানে সংসারের ঘানি টেনে টেনে শরীরের লালিত্যটুকু তার মরে গেছে কবেই। অফিসে অভ্যর্থনার কাজ তার । সুধা ভয় পায়—একদিন হয়তো তার ফ্যাকাসে ফয়াটে চেহারাটা চন্দ্র সাহেবের চোখে ধরা পড়ে যাবে ; তখন হয়তো চাকরিটাও খোয়াতে হবে । স্নো-পাউডার ঘষে-ঘষে হারানো জৌলুসকে কতখানি আর ফিরিয়ে আনা যায় । সুধা ভাবছিল জীবনটা বোধহয় ফুরিয়েই এল , ভালবাসাও তাকে বঞ্চিত করল শেষ পর্যন্ত । সুচারু বোধহয় আর সুধাকে খুঁজবে না ; হয়তো খুঁজেই পাবে না । আসছি বলে সে গেল তো গেলই । চোখের জলকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারছিল না সে ।

এই পর্বের শেষভাগে রত্নময়ীদের সংসার সহসা চঞ্চল হয়ে উঠেছে । নতুন এক সমস্যা তাদের সকলকে বিমূঢ় করে দিয়েছে । এতদিন পরে গ্রাম থেকে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি জানতে পেরেছেন আরতির বাবা কালিকিঙ্কর মারা গেছে । এবং পিতার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আরতি যদি পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করে তা হলে আত্মার সদ্গতি হবে । পুরোনো সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রত্নময়ীর । ওই কালিকিঙ্কর পার্বতীকে কতখানি যন্ত্রণা দিয়েছিল তা ভাল করেই তিনি জানেন । গর্ভধারিণী না হলেও তিনি আরতির মা ছাড়া আর কি ? আরতিও জন্ম থেকেই তাই জেনে এসেছে । না—কিছুতেই পারলৌকিক কাজে আরতিকে ওখানে পাঠাতে পারবেন না তিনিই —চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল রত্নময়ীর । বড়ঠাকুর এদ্দিন পরে চিঠি লিখেছেন । কিন্তু কোথায় ছিল তাঁর ধর্মজ্ঞান—যে-দিন আসন্ন প্রসবা পার্বতীকে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে কালিকিঙ্কর দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল । বুকে করে মানুষ করেছেন তিনি আরতিকে । আজ সে নতুন করে বাবা-মা চিনবে ?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিটা পড়ার পর রত্নময়ীর রাগটা কিন্তু পড়ে আসছিল । তিনি ভাবছিলেন মরবার সময় সত্যি-সত্যি যদি পার্বতীর স্বামী বড়ঠাকুরের হাত ধরে মিনতি করে , 'মেয়ের হাতের জল পিণ্ডি চেয়ে থাকে ।' কিন্তু রত্নময়ী ভেবে পাচ্ছিলেন না আরতিকে এ-সব কথা তিনি জানাবেন কোন উপায়ে ? তাঁর কাছ থেকে সব কিছু শোনার পর সুধার বুকটাও কেঁপে ওঠে । তবুও সুধা জানায় আরতি ওখানে

গেলে ভালই করবে। বাবার সামান্য সম্পত্তির ভাগিদার হয়ে যাবে আরতি। এই অভাব আর অনটনের সংসারে পড়ে থেকে লাভ আছে কি? শুনতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু পোড়খাওয়া রত্নময়ী বুঝতে পারছিলেন কথাটা ঠিকই, সুধা ভুল কিছু বলেনি। হয়তো সুধার মত আরতিকেও চাকরি খুঁজতে হবে একদিন। তারপর লাবণ্য মরবে, মন শুকিয়ে যাবে, মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠবে। সুধাকে দেখে রত্নময়ী বেশ বুঝতে পারছিলেন—মেয়েটার ভিতরটা সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আজ প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে গেছে। মা হয়েও সন্তানদের কাছে তিনি পর। অভাব এ - বাড়িতে নিত্য সঙ্গী। ছোট হয়ে গেছে মন।

এ-বাড়িতে সুখ হারিয়ে গেছে, শান্তি ফুরিয়ে গেছে।
এখানে শুধু খিদে আর কাতরানি, বিরক্তি আর
বিতৃষ্ণা। ক্ষুদ্রতা আর দীনতা। মন নেই আর,
সবই ছোট হয়ে গেছে।

নিজের দিকে তাকিয়ে সুধাও ভাবছিল আরতি চলে গিয়ে বেঁচে যাবে; অন্যথায় এই শ্বাসরোধকর পরিবেশে তাকে ছটফট করে মরতে হবে একদিন। আরতির পাশে শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করছিল:

আমাদের মন এমনই ছোট। পনেরো বছরকে ভুলে যাই, যদি সুযোগ পাই ভুলে যাবার। আমরা সবাই মনে এখন ঠিক এই রকম ছোট হয়ে গেছি। বাঁচার, পেট ভরাবার গায়ের কাপড়ের রেষারেষিতে— এখন এই রাক্ষুসে দিন আমাদের এইরকম ছোট করে তুলেছে। আমরা মেয়ে বেচছি, বোন তাড়াচ্ছি, বউ ছাড়াচ্ছি —ওই রাস্তার কাঙালদের মতন। কী করব, কী করতে পারি বল।

সুধা মুখের মধ্যে কাঁথার অনেকখানি কামড়ে চেপে গলায় ঠাস করে ঢুকিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু চোখ যেন ছিঁড়ে ফেটে একটা অদ্ভুত ভয়ংকর কান্না বাইরে আসতে চাইছিল।

আরতির কাছেও মনে হচ্ছিল সবকিছুই আজ ফাঁকা - ফাঁকা। তার অন্য বাবা-মা ছিল। একজন কবেই মারা গেছে, আর একজন মাত্র ক'দিন আগে। সে এই

নিয়ে দুঃখ বা কষ্ট পাচ্ছিল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল এই কথা ভেবে —— রত্নময়ী তার মা নয়। আরতির বুকটা দুমড়ে মুচড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। যাঁদের এতদিনকার মমতা আর ভালবাসায় সে তিল তিল করে বড় হয়ে উঠল, যাঁরা এতদিন ধরে তাকে বুকে করে আগলে রাখল, — তাঁরা রক্তের সম্পর্ক থেকে অনেক দূরে; —— এই ভয়ঙ্কর সত্যটাকে সে কোনওক্রমেই সহ্য করতে পারছিল না। আরতি গঙ্গাস্নান বাসুর সাথে রিকশাতে করে ফিরছিল। কাঁদছিল সে অবিরল। বাসুরও খারাপ লাগছিল আরতির এই কান্নাতে। সে আরতিকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। কিন্তু তার মুখ থেকে যা বেরিয়ে এল তা আরতিকে নিথর করে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকা মেয়েটির সমগ্র সত্তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যে উপলব্ধি জেগে উঠেছে তা প্রকৃতই মর্মস্পর্শী।

বাসু হঠাৎ বললে — যেন বিরক্ত হয়েই বলতে চাইল অথচ অন্য সুরে বলে ফেলল, 'আঃ! তুই অত কাঁদছিস কেন?' কাঁধে ঠেলা দিল আরতির, 'তোর এত কাঁদবার কী আছে রে! অ্যাঁ —। আমার বাবা আর মরে নি, না—?' আরতি চোখ ছাপানো জল নিয়ে বাসুর চোখে চোখে পাথরের মতন তাকিয়ে থাকল। সমস্ত মুখটা যেন সাংঘাতিক এক চাবুক খেয়ে অসাড় হয়ে গেছে। কালশিটে ফুটেছে। তবু আরতির ঠোঁট ফুলে ফুলে কী যেন বলতে চাইছিল। কথাটা বলার পর বাসুরও কানে লেগেছে নিজেরই। বাসু শুধরে নেবার জন্যে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। না, এত কালের দু'জনের বাবা— আজ একজনের। বাসুর। আমাদের বাবা নয়, আমার। আরতির ফোলা কাঁপা ঠোঁটে একটুও শব্দ নেই। শীতের রোদ তার ঠান্ডা অসাড় ঠোঁটে আর সাড়া তুলতে পারল না।

'খোলা জানলা'(১৩৬৯) 'দেওয়ালের' তৃতীয় পর্ব । ঘটনাকাল জানুয়ারি ১৯৪৪ থেকে জুন ১৯৪৫ । আলোচ্য পর্বের মধ্যে অন্য দুটি পর্বের মতই প্রাধান্য পেয়েছে অ-সুখের গভীর যন্ত্রণা । এর কবল থেকে রেহাই নাই বোধ হয় কারও । আরতি ও উমা ভাল নাই । ভাল নাই সুধাও । তার মানসিক আর্তির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতাও প্রতিকূল পরিস্থিতির ভয়ঙ্করত্বকে ব্যাপকতা দিয়েছে । এই পর্বটি থেকে বোঝা যায় বাসুর বেদনাও কিছু কম নয় । সকলের চোখেই সে উপেক্ষিত, সকলের কাছেই সে অগৃহীত । অসহায়তার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে । গিরিজাপতির দিকে তাকালে বোঝা যায় প্রচণ্ড দুঃসময়ের মধ্যেও জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট । একটা সময় অবশ্য এই শান্ত সৌম্য ভূয়োদর্শী মানুষটির হতাশাও আমাদের কাছে চাপা থাকে না । সন্ত্রাসবাদের নঞর্থক দিকটির পরিচয় গিরিজাপতির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে । প্রায়শ্চিত্তের যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় চরম রিক্ততার মধ্যে নৈতিক চেতনার প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখার লোক বিরল হলেও বর্তমান । তৃতীয় পর্বে কমিউনিস্টদের কাজ—পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল হই । তাদের চোখে গান্ধী টাটা-বিড়লার দালাল, সুভাষ বসু কুইসলিঙ, এম. এন. রায় প্রতিক্রিয়াশীল । কমিউনিজমে বিশ্বাসী নিখিলের মত মানুষদের সংশয়ও লেখক তুলে ধরেছেন । অবশেষে সুচারু ফিরেছে । কিন্তু এ কোন্ সুচারু ? বিধ্বস্ত সে । শরীর ও মন —দু'দিন থেকেই । যুদ্ধের ভয়াবহতা সে কোনওভাবেই ভুলে উঠতে পারেনি । যে মানুষটি একদিন রণক্ষেত্রে গিয়েছিল কিছু অন্বেষণের তাগিদে; সে ফিরে এল এক বুক নৈরাশ্য নিয়ে । সুচারুর মনে হয়েছে বীরপূজার প্রচলিত ধারণা একেবারেই অলীক । তার মতে প্রতিটি বীর যোদ্ধাই এক একজন নৃশংস খুনি । তার ধারণা মানুষ যেহেতু জন্মেছে — একমাত্র সেই কারণেই মৃত্যু পর্যন্ত তার বেঁচে থাকা । অন্য কিছুর জন্যে নয় । জীবনের মধ্যে আদর্শ, নীতি, শুভবোধ — ইত্যাদির কোনও স্থান নাই । গিরিজাপতি এ-সব কথা মানতে চাননি । কিন্তু সুচারুর সীমাহীন নৈরাশ্য তাঁর মত পরিণত মানুষকেও বিচলিত করে তুলেছে । সুচারুর আর্ত-যন্ত্রণাপীড়িত অন্তরকে তিনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন ।

সুচারুর এই ভগ্নরূপ কি-তু অসহ্য ঠেকেছে সুধার কাছে। যে ফিরে আসার কথা দিয়ে গিয়েছিল — সে ফিরে এসেছে; কি-তু এ কী চেহারা তার? শূন্যতার এই প্রতিমূর্তিকে সে তো কোনও দিন কল্পনা করেনি। সুধা স্তম্ভিত হয়েছে। সে নিজেও ভগ্নপ্রাণ, তবুও জীবনের মায়া তার অস্তিত্বের পরতে-পরতে জড়িয়ে। সুধা চেয়েছে সুচারুও তার হতাশা এবং অবিশ্বাসকে মুছে ফেলে নতুন করে বেঁচে উঠুক। চরম অবক্ষয়ের মধ্যে জেগে উঠুক জীবনের স্বপ্ন।

আরতির যখন জানবার কোনও প্রয়োজন নাই —তখনই সে জানতে পারল চন্দ্রকান্ত-রত্নময়ী নয়; কালিকিঙ্কর এবং পার্বতী-ই তার আসল বাবা-মা। এই প্রয়োজনহীন এবং মর্মান্তিক পরিচয়ের বেদনায় সে শুধু দীর্ন হয়েছে। আরতির মত উমার বুকের মধ্যেও অ-সুখ শিকড় ছড়িয়েছে। উমা তার ভাগ্যের সঙ্গে আরতির ভাগ্যের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছে। আরতির মত তারও বাবা-মার কথা মনে নাই, যেটুকু আছে – সামান্যই। তার কাছে অসহ্য মনে হয় এই শহর কলকাতা। তার মনে হয় এই শহর তাদের কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেবে; এক এক করে হারিয়ে যাবে জীবনের মূল্যবান সম্পদগুলো, শেষকালে হয়তো জীবনটাও। এখানে শুধু হইচই, গণ্ডগোল আর অশান্তি। দিনরাত হাঘরে ভিখারির কান্না। যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি তো আছেই। উমার মনে হয় কলকাতা বড় নিষ্ঠুর, এখানেও সবাই তাকে শুধু ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়।

> অথচ হেতমপুরে তার কোনো দিন এমন করে এ-সব কথা মনে হয় নি। কবে থেকে সে হেতমপুরে মানুষ উমা জানে না। কি-তু সেখানে এমনভাবে কেউ উমাকে দেখত না। পাশাপাশি কত বাড়িতে গেছে, পাড়ায় ঘুরেছে, বেড়িয়েছে —কই নতুন দু'চার জন ছাড়া কেউ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখে নি। ভালুক নাচ দেখাতে এলে ছেলের দল যেভাবে দল বেঁধে ভালুকের পিছু পিছু যায়, আর ডুগডুগি বাজানো মানুষটাকে অস্থির করে মারে— ঠিক সেইভাবে উমার পিছু পিছু ছেলেগুলো দল করে কোনো দিন যায় নি। এই কলকাতায় কি-তু তাই গিয়েছিল।

উমার মনে হল, এই কলকাতা বড় নিষ্ঠুর, সংসার নিষ্ঠুর, মানুষ নিষ্ঠুর।

বেশ কিছুদিন ধরেই সুধার শরীর খারাপ। পাড়ার ডাক্তারকে দেখিয়ে কোনও উপশমই হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেবব্রতর চিকিৎসাতেই অসুখটা আয়ত্তে এল, যদিও সারা শরীরে দুর্বলতা থেকেই গেছে। সুধার মনে হয় এই অসুখের জন্যে মা যেন বিরক্ত। সুধা কতটা কষ্ট ভোগ করেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সংসারের কিছু টাকা সে খরচ করিয়ে দিল। মায়ের অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সুধার মন ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছিল। বুকে ছবি নেবার কথা শুনে রত্নময়ী অসহায়ের মত জিগ্যেস করেছেন —'কী হয় সে ছবিতে?'—সুধা জ্বলে উঠেছে সেই মুহূর্তে।

'কী হয়? কী হয় তুমি জান না, মা?'
সুধা কয়েক মুহূর্ত তার ভয় উৎকণ্ঠা অবসাদ
যেন ভুলে গেল, মার ওপর অপরিসীম ঘৃণা
বিতৃষ্ণা শত্রুতা বোধ করছিল। মনে হল, এ-
সংসারে এই মানুষটার মতন স্বার্থপর নিষ্ঠুর
কুটিল আর কেউ নেই। শত্রু, সুধার সবচেয়ে
বড় শত্রু এই মা।

এই পর্বে অবনী নামক এক যুবকের পরিচয় আমরা পাই যার জীবন গাঢ় অ-সুখের অন্ধকারে আবৃত। সে গিরিজাপতিদের প্রেসে কাজ করে। সৎ এবং পরিশ্রমী এই যুবকটিকে গিরিজপতি খুবই পছন্দ করেন। অবনীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তিনি তার দুঃখের কথা শুনছিলেন। সেইসময় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর।

অবনী যেন অন্য কারও গল্প শোনাচ্ছে এমনভাবে
বলল, 'আমার বাবা থিয়েটারে বাঁশী বাজাতেন।
কী একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পর আত্মহত্যা
করেছিলেন। আমার মাকে দেখেছি নানারকম অসুখে
ভুগত, শেষে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল। মাঝে
মাঝেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরত, এঁটো-

কাঁটা কুড়িয়ে খেত, যার সামনে হাত পেতে ভিক্ষে চাইত।' অবনীর বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন তার মার এই আচরণগুলি আজ আর প্রকাশ করতে কাতর নয়, অথচ তার গলার গাঢ়তা সন্তানের কাতরতা প্রকাশ করছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল অবনী, তারপর বলল, একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে শুনি মা পাড়ার একটা বাড়িতে গিয়ে ভাত চেয়ে খেয়েছে। মাকে আমি মেরে-ছিলাম সেদিন। তারপর স্কুলে যেতাম না। আমার ম্যাট্রিক ক্লাস তখন; জ্যেঠাইমা বকত, রাগ করত। আবার একদিন স্কুলে গেলাম। টেস্ট পরীক্ষা সামনে। আমি স্কুলে, জ্যেঠাইমা দুপুরে একটু ঘুমোচ্ছিল; মা বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেল।'

অবনীর কথা বারবার ভাবছিলেন গিরিজাপতি। তাঁর মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি 'বর্তমানের আর এক প্রতিনিধি' দুর্যোগের মধ্যে কোনরকমে বেঁচে থাকার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কি-তু সেই সাবলীলতা কোথায়?

সুধার শরীরের কাহিল অবস্থা দেখে অমলা তাকে পরামর্শ দিয়েছে ভাল করে ডাক্তার দেখানোর জন্যে। শরীরের যত্ন না নিলে সুধাকে ভুগতে হবে,—এ-কথা সে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো চাকরিটাই তাকে খোয়াতে হবে। অভ্যর্থনার কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় মিষ্টি হাসির সঙ্গে সুন্দর-সুস্থ শরীরের যোগ তো আছেই। ভয়ঙ্কর আশঙ্কাতে কেঁপে উঠেছে সুধা। সে সব জানে, কি-তু সামর্থ্য তার কোথায়? অমলা ভেঙে পড়া সুধাকে সান্ত্বনা দেয়, সুধা জানে অমলাদি, প্রকৃতই তাকে ভালবাসে। স্কুলের চাকরি, তারপর মিশন রো-র অফিস, শেষে এই নতুন কাজ। প্রতিটি স্তরেই অমলাদি তাকে সাহায্য করেছে, তার হাতটাকে শক্ত করে নিজের মুঠিতে চেপে ধরেছে। অমলা সুধাকে ভালবেসে—সাহায্য করে তৃপ্তি পেয়েছে, কারণ সে নিজে যা পারেনি — সুধা তাই পেরেছে। সুধার মধ্যেই তার

অচরিতার্থ ইচ্ছা যেন ফুটে উঠেছে শতদল হয়ে ।

এই মেয়েটাকে কেন সে ভালবাসে । কেন ?
কখনও কখনও অমলার মনে হয়েছে, সুধার
কাছে যেন সে কিছু সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে বলে
নিজের স্বার্থে সুধাকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে রাখার
চেষ্টা করছে । অথচ কোন সম্পদ কবে কখন
রাখল জিজ্ঞেস করলে অমলা জবাব দিতে পারবে
না । দেওয়া মুশকিল । এ-কথা অমলাই এখনও
স্পষ্ট করে বোঝে না যে, নিজের জীবনের দুঃখ
দারিদ্র্য বঞ্চনা ভালবাসা হতাশার মধ্যে সত্যি সত্যি
কী আগলে রাখবার চেষ্টা করেছিল অমলা, অথচ
শেষ পর্যন্ত পারে নি । হৃদয় না নৈতিক পবিত্রতা,
নিষ্ঠা না এই প্রতিকূল সংসারের ক্ষীণ শক্তি নিয়ে
শেষাবধি যুঝে যাওয়া — অমলা কী পারে নি,
অথচ পারতে চেয়েছিল, সুধা যা পেরেছে, পারছে ।
হয়ত সুধার কাছে অমলার সেই স্পৃহা ও আন্তরিক
স্বপ্নগুলি লালিত হয়ে আছে ।

উনচল্লিশের কলকাতা এখন মহানগরীতে রূপান্তরিত । তার সর্বাঙ্গে এখন পরিবর্তনের জোয়ার । সমস্ত চাহিদার জোগান যেন এইখানেই । কলকাতায় এখন চাকরির ছড়াছড়ি । মিলিটারি রিক্রুটমেন্ট, সরকারি-বেসরকারি কত ধরনের কাজ, সাপ্লাই, কন্ট্রোল এ সবের কমতি নাই । চারপাশে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, গুদাম, ফ্যাকটরি —আরও কত কিছু।গ্রামের কৃষক আজ শহরে এসে শ্রমিকে-দিন মজুরে পরিণত হয়েছে ।

কৃষক- এখন শ্রমিক-দিন মজুর । দুর্ভিক্ষের ডামাডোলে
চরণামৃতের মতন পাওয়া জমিটুকু কবে বেচে দিয়ে
শহরে অন্নের কাঙাল হয়ে এসেছিল, আজ আর কে

সে জমির ভরসা করে । নতুন আইন করে এই জমি আবার ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে । কি-তু কে যাবে সে জমি নিতে ? কী আছে অন্ন, বিলাস্ রহিমের সেখানে? মাথা সমান ধার-দেনা, লাঙল গরু জোতদারের কাছে, ম্যালেরিয়া আর আমাশার মড়ক চলেছে গ্রামে, তাছাড়া বাবুমশায়, গত বছর আকালে এই শহরে এলুম, বউটা পথ থেকে হাবিশ হয়ে গেল, বোনটা পুলিশের গাড়িতে চেপে কোথায় গেল জানি না কো, মা-ষ্টা, মরল, ছেলেটা-ওর মা-র ট্যাকে বাদুড় ছানার মত লেপটে ছিল--- এখন সেটাও মরেছে । ই শহরই ভাল, গতর দিলে মেলা কাম । রাজমজুরি করলে দিন পাঁচসিকে দেড় টাকা, কারখানায় দু'টাকা আড়াই টাকা, চাল গম পাই হ-তা হ-তা ।

শহর কলকাতায় এই হতভাগ্য মানুষগুলিই শুধু আসেনি, এসেছে আরও কিছু মানুষ--- দু'চোখে যাদের দুর-ত লোভ । যুদ্ধের মওকায় এইসব ভাটিয়া, মাড়োয়ারি, পঞ্জাবিরা ফেঁপে উঠেছে ।

তিন পুরুষ পরিশ্রম করলে যে অর্থ জমানো সম্ভব--এরা এক পুরুষের এক চতুর্থ জীবনে সেই অর্থ সঞ্চয় করছে । কন্ট্রোল, পারমিট আর লাইসেন্স ; কনট্রাকট টেন্ডার আর ঘুষ ; হোর্ডিং ফোড়ে আর প্রকাশ্য খয়রাতি --- ঈশ্বর কৃপায় অর্থ তোমার করপুটে আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়বে ।

এই ডামাডোলের বাজারে সবকিছুই যেন অস্বাভাবিক ভাবে বদলে যাচ্ছে । দ্রুত । ভাল ভাল মানুষ পর্যন্ত অন্ধকারের দিকে ঝুঁকে পড়ল । পরিচিত ঘনিষ্ঠ মানুষদের এই অসুস্থতার ছবি গিরিজাপতির মন থেকে শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে ।

বড় অশান্তির দিন যাচ্ছে । ভাল লাগে না, সুখ পান না, তৃপ্তি নেই আর । গিরিজাপতি উঠে পড়লেন ।

> তাঁর মনে হচ্ছিল, এ এক অদ্ভুত পৃথিবীতে তিনি বসে আছেন। সংসারের চেহারাটা কেমন বদলে গেছে তাই তিনি দেখছেন। মিহির আর চিন্তর মত মানুষ আজ অর্থের লোভে লালায়িত। এক সময় এরা দেশের কাজে জীবন পণ করেছিল, ত্যাগ করেছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সয়েছে, আদর্শের জন্য মুখের রক্ত তুলেছে। অথচ আজ এরা পাকা ব্যবসাদার অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর, ঠগ। চোর সাধু হয় — এ ছিল পূর্বের প্রবচন, এখনকার দিনে সাধু চোর হয়।

সুধা ক্রমশ ক্লান্ত-নির্জীব হয়ে পড়েছে। দু'আড়াই মাস হল দফায় দফায় ইনজেকশান ওষুধ চলছে, কিন্তু শরীর আর সারছে না। ডাক্তারের ধারণা যক্ষ্মা হয়েছে সুধার, সে কথা অবশ্য তিনি বলতে পারেননি। সুধা এখনও জানেই না তার অসুখটা কি? কিন্তু ভুগতে ভুগতে শরীর ও মন দু'দিক থেকেই বিধ্বস্ত সে। ফ্যাকাসে মলিন সুধার কাছে পৃথিবীটাও আজ বর্ণহীন। এই অবস্থার জন্যে সে সংসারকে দায়ী করে। তিল তিল করে সে ক্ষয়ে গেছে সকলকে বাঁচাতে গিয়েই, কিন্তু তার কষ্ট কেউ বোঝেনি। বোঝার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কারও মধ্যে ছিল না কোনদিন। মা, বাসু এবং আরতি —কেউ নয়। সকলে শুধু নিজেদের কথাই ভেবে গেছে; আর স্বার্থপরের মতন নিংড়েছে সুধাকে। কৃতজ্ঞতা নয়, একফোঁটা সহানুভূতি কি এদের কাছ থেকে সুধার প্রাপ্য ছিল না?

আলোচ্য পর্বটির মধ্যে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ, তাদের চিন্তাধারা সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করেছেন। এই আলোকসম্পাতে র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, এম. এন. রায়, ইউনাইটেড স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন, গান্ধী, সুভাষ বসু — প্রভৃতি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মনোভাব - প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহরমপুরে নিখিল মিটিং করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল তা মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। সংগঠনের ভিতর সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পরিবেশ তাকে বিচলিত করেছে। গান্ধীজিকে 'টাটা বিড়লার এজেন্ট বা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নীলামদার', সুভাষ বসুকে

'কুইসলিঙ', এম. এন. রায়কে 'ট্রেটার', — প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করাটা কমিউনিস্টদের কাছে একদা যথেষ্টই প্রিয় বিষয় ছিল। পরের দিকে অবশ্য এই সব শব্দগুলি নিয়ে তাদের খেলা বিরত হতে হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের পট-ভূমিকাতে কংগ্রেসি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ও মধ্যবিত্ত সমাজকে গতিনির্ভরতা দিতে গিয়ে কমিউনিস্টরা কেন সেভাবে সাফল্য পায়নি, — তার আভাস সামান্য হলেও লেখক দেবার চেষ্টা করেছেন।

বাসুকে নিয়ে তাদের বাড়িতে কেউ-ই সন্তুষ্ট ছিল না। বিশেষ করে সেই দিনের ঘটনাটায় স্পষ্ট হয়ে গেল সংসারে তাকে কোনওজনই গ্রাহ্য করে না। আপদ বিদেয় হলেই সবাই যেন হাঁফ ছাড়ে। সেদিন বাসুর সঙ্গে সুধার কথা কাটাকাটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সুধা স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দিল, 'এ বাড়িতে থাকতে হলে আমার কথা তোমায় শুনতে হবে। না শুনতে চাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।' বাসুর সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছিল। দিদি তার সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলবে, অধিকার-কর্তৃত্বের প্রশ্ন তুলে চোখ রাঙাবে, — সে ভাবতে পারেনি। বিছানাতে বাসু যা চিন্তা করছিল তাতে শুধুই যন্ত্রণা।

> আজ এতক্ষণে বাসু স্পষ্ট তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছিল। দিদি আজ তাকে অপমানই করে নি শুধু, একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। সে আর দিদির ভাই নয়। দিদির সংসারে যে বাসু অবাঞ্ছিত আজ স্পষ্ট করে তা জানা গেছে। দিদি তাকে ঘেন্না করে, তাকে ইতর এবং চামার ভাবে। তার জন্যে মাকে ঠুকে ঠুকে কথা শোনায়, গায়ের চামড়ায় ফোসকা পড়ে এমন সব অপমান করে। মাও তার জন্যে অসুখী। মারও শান্তি নেই বাসুর জন্যে। বাসু এমন কী করছে যার জন্যে এত অশান্তি বাড়িতে। মা তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বলেছে, বলেছে খাওয়া থাকার টাকা দিদির হাতে গুনে দিতে না পারলে কাল থেকে তার ভাত জুটবে না।

বহুক্ষণের পুঞ্জীভূত অভিমান এবং দুঃখ যেন গলে গলে বাসুর বুকের তলার বেদনার পাত্র পূর্ণ করে তুলল। দীর্ঘশ্বাস গলার কাছে উপচে উঠে মুখ এবং নাক দিয়ে বেরিয়ে এল। বালিশে সেই শ্বাসের ভাপ লাগল, বাসু তার উষ্ণতা অনুভব করল। তার চোখের এবং নাকের চারপাশে মাংসের তলায় কেমন একটা কনকনে যন্ত্রণা।

শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে সুচারু। ফিরে এসেছে দীর্ঘকাল পরে-- অনেক পরিবর্তনের মধ্যে এবং অনেক পরিবর্তনকে সঙ্গে নিয়েই। যুদ্ধে তার প্রাণ যায়নি ঠিকই, কিন্তু সে অক্ষতও থাকেনি। একটা হাত বাদ দিতে হয়েছে তার। মনের মধ্যে সমস্ত আশাই যখন উধাও,--সেই সময়ে সুচারুর উপস্থিতি, বিশ্বাস হচ্ছিল না সুধার। তার সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দীর্ঘকালের জমে থাকা বেদনা যেন এখন কান্না হয়ে ঝরে আসতে চায়। সুচারু যাবার সময় বলেছিল, --'আমি আবার আসব-- ফিরে এসে তোমায় খুঁজব'। সুধা জানিয়েছিল,-- 'খুঁজতে হবে না তোমায়; যদি বেঁচে থাকি আমি থাকব। তুমি এস।' এক ভয়ঙ্কর সময়ের স্রোতে তারা দু'জনে হারিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা ঘটেনি। দু'জনেই কথা রেখেছে: যেহেতু দু'জনেই দু'জনকে আবার খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু তারপর কী ঘটতে পারে, কী আশা করা উচিত। প্রাণে হয়তো বেঁচে আছে তারা--কিন্তু চরম সঙ্কটে হারিয়ে গেছে তো অনেক কিছুই।

চাকরির জন্যে বাসু যখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আরতির একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সে এখন চাকরি করতে যায়। সুধার চাকরিটা এখন যাবার দশাতেই। বাসু ভাবছিল -- মেয়ে হয়ে জন্মালে হয়তো তারও একটা হিল্লে হয়ে যেত। একদিন আচমকা সে আরতিকে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করতে দেখল তাদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। পরে তারা ঘনিষ্ঠভাবে রিকশাতেও উঠে বসল। বাসু পেছনে পেছনে ছুটছিল। তার মনে হচ্ছিল --'একটা রাস্তার লোক তার-- তাদের অনেক কষ্টে বাঁচানো কী একটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!' রাতে আরতির কাছে ছেলেটির পরিচয় জানতে চায় বাসু। আরতি না বোঝার ভান করে।

বাসুর সহ্য হয় না। সে জোরে আরতির হাত মুচড়ে ধরে; তার গালে চড় কষিয়ে দেয়। আরতি তবুও কোনও কিছুই জানাতে রাজি নয়। দাদা তাকে মেরে ফেললেও সে মুখ খুলবে না। বিছানায় শুয়ে আরতি মনে মনে বাসুকে ধিক্কার জানাচ্ছিল। বাসুর এই দাদাগিরি তার কাছে মনে হচ্ছিল অত্যাচার। আরতি চিন্তা করছিল সেতো বাজে লোকের সঙ্গে রিকশাতে চেপে বসেনি। নাম তার বিশ্বময়। আরতিদের দোকানেই চাকরি করে। দোকানে ওর যথেষ্ট মর্যাদা আর সম্মান। অমন ঝকঝকে ছেলেকে সকলেই পছন্দ করে। বিশ্বময় সবার মধ্যে আরতিকে আলাদা চোখে দেখে। এই নিয়েও ঈর্ষিত কথাবার্তার শেষ নাই। এমন সুন্দর ছেলেকে কিনা দাদা এরকম যাচ্ছেতাই ভাবে গালিগালাজ করল। আরতি ভেবে পাচ্ছিল না তার দোষটা কোথায়? —দিদি কি সুচারুদার সঙ্গে ভালবাসা করেনি? —এই জন্যে দিদি তো কত কষ্টই সয়েছে। আর দাদার কীর্তিও আরতির অজানা নয়। উমার সঙ্গে সে কী করতে চাইত; মুদিখানার মেয়ে পার্বতীকে নিয়ে কী করেছে, —সব সে জানে। সে জানে বাসু মদ খায়। বাসুর প্রতি আরতির সারা শরীরে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছিল।

গিরিজাপতি উমার বিয়ের জন্যে অবনীর কথা ভেবে রেখেছিলেন। ভেবে-ছিলেন এই পরিশ্রমী সৎ ছেলেটি নিশ্চয়ই উদারতার পরিচয় দিয়ে তাঁর কথা ফেলতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অক্ষমতা প্রকাশ করে অবনী চিঠি দিয়েছে। চিঠির প্রতি ছত্রেই অসুস্থতার ইঙ্গিত। অবনীর চিঠি থেকে জানা যায় তার বাবা নোংরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, পরে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়ান। তার মায়ের সর্বনাশ ঘটেছিল ওই একই রোগে, শেষ পর্যন্ত তিনি বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। অবনী চিঠিতে জানিয়েছে:

> *** আমি বেশিদিন বাঁচব না। আপনার কাকাকে একদিন বলেছিলাম। উনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু আমি জানি আমার আয়ু খুব কম, বাবার মতন আমিও অল্প বয়সে মরব। আমি যে আমার মা-বাবার রক্ত গায়ে নিয়ে বেঁচে আছি তা তো জানি। আপনার

বোনকে বিয়ে করলে তার জীবন নষ্ট হত । আমার
ওপর দু'চার দিনের ভরসা করা যায়, সারা
জীবনের নয় । * * * * *

চিঠিটা অবনী লিখেছিল নিখিলকে । কিন্তু সরাসরি সেটি পড়ল উমার হাতে গিয়ে । পড়তে পড়তে জাগতিক সব কিছু থেকে সে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল । 'লুপ্তচেতন মৃতের মতন' বসে ছিল উমা ।

বাসু এখন আরতিকে যতটা সম্ভব আগলে রাখার চেষ্টা করে । সে চায় না আরতি কোনও বাজে খপ্পরে পড়ে যাক । আরতি কিন্তু বাসুর এই প্রহরাকে জবরদস্তি ছাড়া অন্য কিছুই ভাবে না । একদিন সে অসহিষ্ণু হয়ে কথার মধ্যে বাসুকে শুনিয়েও দিল, 'একদিন না একদিন তুমি আমায় মারবে ।' কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল বাসু । রাতে চোখে ঘুম আসছিল না তার, মনের মধ্যে বারবার আরতির ওই কথাগুলো ঘুরেফিরে আসছিল । ছি—ছি, শেষ পর্যন্ত আরতি এই রকম কথা বলতে পারল । বাসুকে তাহলে সে একেবারেই বিশ্বাস করে না । প্রচন্ড ঘৃণার সঙ্গে বাসু ভাবছিল— আরতি সত্যি-সত্যিই তার বোন নয় । না, বাসু তাকে মারবে না, নিজেই মরুক আরতি । ছটফট করতে করতে বাসু কলঘরে গিয়ে হাত-পা-গায়ে জল ঢালছিল । এমন সময় কেরোসিনের গন্ধ নাকে এল তার । টিনের দরজার সামনে একটা শাড়িও দেখতে পেল সে, কেরোসিনে তার বেশ কিছুটা ভিজে রয়েছে । বাসু শাড়িটা চিনতে পারল । উমার । সিঁড়ির ধাপে বসে উমা কাঁদছিল তখন ।

বাসু করুণা এবং মমতা বোধ করছিল ।
উমা কেন শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে মরতে
গিয়েছিল সে জানে না, কেন সে মরতে
গিয়েও মরতে পারে নি তাও জানে না,
তবে বাসু বুঝতে পারছিল এই মেয়েটার
ভীষণ দুঃখ । অসহ্য কষ্টে না পরলে মানুষ
কি মরতে যায় ? হয়ত বাসুও একদিন মরতে
চাইবে । উমার মতন সে কেরোসিন তেল গায়ে

ঢালবে না। বিষ খাবে, কিংবা গলায়
দড়ি দেবে।

যুদ্ধ প্রত্যাগত সুচারু জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপেই উদাসীন। ধর্ম-ন্যায়বোধ-বিশ্বাস,—এ গুলির কোনও মূল্যই আজ তার কাছে নাই। গিরিজাপতি কিন্তু অন্যরকম ভাবেন। একদিন আমরা অবশ্যই রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথ থেকে সরে আসব,—এই তাঁর ধারণা। সুচারু ভাবছিল; 'তিনি সুখ নিদ্রায় শায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন।' তার যুক্তি: যুগে যুগে কৃষ্ণ আসে ধর্মরাজ্য স্থাপনার আশ্বাস দিয়ে, আর সেই ফাঁকে অর্জুনরা যুদ্ধ করে। গিরিজাপতি সুচারুর কথা শুনে হতবাক হয়ে যান। সুচারু বলে:

'আদর্শ আর মানবতার নাম করেই ঢেউগুলো
আসে। পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য বিস্তারের জন্যে
সবাই পাগল। এক সময় আমি বোকা
ছিলাম; ছেলেমানুষ ছিলাম, বিশ্বাস
করেছিলাম জগতে একটা অন্যায় একটা ন্যায়
আছে; আমার ধর্ম ন্যায়। এখন তা
বিশ্বাস করি না।'

গিরিজাপতি সুচারুকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। চরম আঘাত পেয়ে সম্ভবত ওর মনের মধ্যে ঘোর অবিশ্বাস প্রকট হয়ে উঠেছে।

গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছিলেন,
সুচারুর কথায় এক সত্য আছে যা
হৃদয়কে স্পর্শ করে। ন্যায়ের বোধ কি
সংসারে বেঁচে আছে আজ? এই যুদ্ধের
ডামাডোলে ঘরে বসে বসে তিনি যতটুকু
দেখলেন, যা দেখলেন, তা কি ন্যায়ের
ফল? কোন ন্যায়ে এই অসন্তোষ বিক্ষোভ
হত্যা? অনাহার মৃত্যু দুর্ভিক্ষ? কোন নীতি-
জ্ঞানের বশে পদ-দলন? কোন সৎবোধে

এই মানুষের সমাজে আজ লোভ-লালসার
প্রমত্ততা ?

সুচারু মনে করে 'মানুষের সভ্যতার বড় বড় বীররা সকলেই সুদক্ষ খুনে ।' গিরিজাপতি এই শূন্য হৃদয় যুবকটির জন্যে সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠছিলেন । নিজের জীবনের একটা গোপন অধ্যায় সুচারুর সামনে উন্মোচিত করবেন কিনা—ভাবছিলেন তিনি । রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও দু'জনের মধ্যে আলোচনা চলছিল । আগেকার রেশ টেনে সুচারু বলল :

*** মানুষ কবে আর জ্ঞানবানের মত বাঁচে ।
জীবনের প্রবৃত্তি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে, ইতর
প্রাণীর মতনই সে বাঁচে । * * * অর্থটর্থ
বাজে কথা, জীবনের কোনো অর্থ নেই,
বাঁচারও কোনো অর্থ নেই । আমরা যেহেতু
জন্মগ্রহণ করি সেহেতু মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচি ।

ফিরে এসেও সুচারু গিরিজাপতির কথা ভাবছিল আর মনে মনে তাঁর ভাবনাকে উপহাস করছিল । যুদ্ধের যে বর্বরতা-নৃশংস রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, তাতে মানবিকতা-সভ্যতা এ-সব কিছুই আজ তার কাছে ফাঁকা আওয়াজ ভণ্ডামি ছাড়া অন্য কিছু নয় ।

নৃশংস । যদি বল মানুষের উপাস্য কী, তবে
এই যুদ্ধ তোমায় তার উপাস্য স্পষ্ট করে দেখিয়ে
দেবে । আমি সামান্য কিছু দেখেছি । মনে মনে
সুচারু বলল : আমি কিছু দেখেছি । আমি দেখেছি,
বিধ্বস্ত শহরের একটি ভাঙাবাড়ির তলায় চাঁদের
আলোয় এক মা তার ছেলের বোমায়-উড়ে আসা
এক টুকরো কাটা পা কোলে নিয়ে বসে আছে ;
আমি দেখেছি, ওরা নষ্ট ফলের বাগানে একটি
যুবতীকে সেদ্ধ মুরগীর মাংসের মতন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
উপভোগ করছে, জাপানী গেরিলারা কিশোরী
মেয়ের স্তন কেটে মৃতদেহ ফেলে গেছে ; অথর্ব

বৃদ্ধকে বাঁশের মাচার ওপর বেঁধে স্নাইপাররা
ঝোপের পাশে লুকিয়েছে, গ্রাম লুঠ করে পালাবার
সময় অবশিষ্ট পাতার আর বাঁশের কুঁড়েঘরে আগুন
ধরিয়ে দিয়েছে। ধানের গোলা পুড়ে তার গন্ধ
আমার নাকে কেমন লেগেছে, আমি জানি। আমি
আরও দেখেছি, অন্য ছবিও তুলেছি। যুদ্ধের
মহাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই, জাপানী অথবা
বৃটিশ, আমেরিকান অথবা ইণ্ডিয়ান সব সমান।
সাদা হাত, হলুদ হাত, কালো হাত—সব হাতই
সমানভাবে রাইফেলের ট্রিগার টেনে দেয়, একইভাবে
গ্রেনেড দোঁড়ে। এ সোলজার ইজ অ্যান অটোমোবাইল
দ্যাট ওয়ার্কস পারফেকটলি রহিট হোয়েন দি এঞ্জিন
রানস্।

'নিজের লেখা' লেখার সময়ে নৈরাশ্যপীড়িত সুচারুর কথাগুলো গিরিজাপতির মনের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সুচারু ভাবে বেঁচে থাকাটা নিতান্তই এক দায়। তিনি কি-তু অন্যরকম ভাবেন। তাঁর কাছে জীবনের অর্থ অন্য—অন্যতর কিছু। গিরিজাপতি মনে করেন অনেক সময় —অনেক কিছুর জন্যেই ক্ষয় শুরু হয়ে যায়, ধীরে ধীরে জীবনটা ঝাঁঝরা হতে থাকে, মানুষ হয়ে উঠে পশুর মতন ভয়ঙ্কর। কি-তু নীতি-নিয়ম-শুভবোধের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এই উত্তরণই তো সভ্যতার জিয়নকাঠি। তাঁর মনে হয়:

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
(জীবনানন্দ, 'সুচেতনা')

তা সত্ত্বেও বর্তমানের চরম অবিশ্বাস, মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয় গিরিজাপতিকে বিশেষ ভাবেই ব্যথিত করে তুলেছে। চেনা মানুষের ভিড়ে তিনি নিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনের করুণ অপচয়। তিনি জানেন সুচারুর যন্ত্রণা, বিশ্বাসহীনতা, তা-সুখের দাহ প্রমাণ করে সে বিশ্বাস-বিচ্যুত নয়; কি-তু তার যুক্তি- ও ধারণাকে

একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভবপর নয়, অন্তত বর্তমানের এই চরম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

গিরিজাপতি নিজস্ব অতীতের দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করছিলেন। উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদী হিসাবে সেদিন তিনি যে অন্যায় করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত ঘটে চলেছে আজও। পৌরুষের মুখোশে ঢাকা হিংসার সেই জঘন্য মূর্তি আজও তাঁকে শিউরে তোলে। গিরিজাপতির উপর সেদিন নির্দেশ হয়েছিল পার্টির এক ট্রেটারকে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। গুলি করতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতন এই বিখ্যাত বিপ্লবী কর্মী বিশ্বাসঘাতক? কিন্তু মুহূর্তের দ্বিধাকে মুছে ফেলে গুলি করলেন গিরিজাপতি। সেই মাত্র মানুষটি একটি চিঠি লেখা শেষ করেছিলেন। চিঠিটা খুলে পড়ার পর থেকেই বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁর। এ তিনি কী করেছেন।

চিঠিতে এক সৎ নিষ্ঠাবান মানুষ তাঁর স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে লিখেছিলেন। নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ দ্বন্দ্ব .....। লিখেছিলেন, বিপ্লবীদের প্রমত্ত ক্ষমতা অধিকারের কথা। অবিশ্বাস আর নৃশংসতার কথা।

*   *   *   *   *   *

যে আদর্শ উন্মত্ততা নৃশংসতাকে একদিন গিরিজাপতি পৌরুষ মনে করতেন সেই আদর্শ তাঁর কাছে দানবের আদর্শ মনে হল, মনে হল এই বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন তাণ্ডব কেবল স্বৈরাচার আর আত্মমোহ। এখানে যে কী হীনতা, কত পশুত্ব লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। মোহের বেদিতে দেশ পুষ্পমাল্য দিচ্ছে।

গ্লানি অনুশোচনা পীড়ন ও বিবেকের দংশনে গিরিজাপতি পাগল হয়ে যেতে বসেছিলেন। তিনি এই পশুর মত কাজ করলেন; কেন?

*   *   *   *   *   *   *

কে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণপোষণ করবে ?
ওঁর দুটি অবোধ শিশুর কথা উনি চিঠিতে বার-
বার লিখেছেন । লিখেছেন, তাঁর কেউ নেই
বলে ঈশ্বরের হাতে তাদের দিয়ে গেলেন ।

এর পর থেকেই গিরিজাপতির জীবনে শুরু হয়ে গেল প্রায়শ্চিত্তের পর্ব । নিজের কাঁধে তিনি তুলে নিলেন এক ভাগ্যহীনা বিধবা আর অবোধ দুটি শিশুর যাবতীয় দায়িত্ব । গিরিজাপতি জানেন কী অনায়াসেই একজনকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হয় । কিন্তু চরম দুর্যোগের ভিতরেও সহস্র ঝুঁকি নিয়ে এই মানুষটি — প্রায়শ্চিত্তকামী এই মানুষটি পূজার মতই তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন । বৌদি নবদ্বীপে মারা গিয়েছিলেন । নিখিল আর উমাকে নিয়ে গিরিজাপতি হেতমপুরে স্থায়ী ঘর বাঁধলেন । ওরা জানে না —'ওরা কোনো দিন জানতে পারল না এই কাকাই তাদের পিতৃহন্তা'। গিরিজাপতি এখনও বিশ্বাস করেন 'মানুষের নৈতিক চেতনাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন । এ-বোধ না থাকলে জীবন অর্থহীন ।'

শেষ পর্যন্ত বাসু যুদ্ধে যেতে চেয়ে নাম লিখিয়েছে । দু'একদিনের মধ্যেই সে চলে যেতে চায়, তবে নিঃসাড়ে । সে চায় না বাড়ির কেউ তার যাবার কথা জানুক । আবাল্য সঙ্গী গৌরাঙ্গকে অনুরোধ করে চলে যাবার পর খবরটা বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে । গৌরাঙ্গের কোনো আপত্তি সে শুনতে নারাজ । বাসু বুঝে গেছে—সকলের চোখে সে একটা গুণ্ডা-বদমাশ ছাড়া আর কিছুই নয় । মা-দিদিও ওই একই রকম ভাবে । আর আরতি—সে তো তাকে নিলাট শয়তান বলেই ভেবেছে । গৌরাঙ্গ বন্ধুর যন্ত্রণা বুঝতে পারছিল ।

এতদিন ধরে আমরা বাসুর রুক্ষতা, তার ভোঁতা মানসিকতা, স্বার্থপরতা— এই সব কিছুর সঙ্গেই পরিচিত, কিন্তু চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে গৌরকে যা বলেছে— তাতে তার চরিত্রের অনাবিষ্কৃত একটি দিক আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে । বাসু বন্ধুকে জানিয়েছে দিদির সঙ্গে সুচারুর বিয়ে হলে তাকে যেন জানানো হয় । আর যে মা জীবনে কোনদিন সুখের মুখ দেখতে পেল না, সে যদি মরে যায়, তাহলে গৌর যেন তাকে চিঠিতে জানায় । সে আসবে । আরতির নামে বাসু

জ্বলে উঠেছে । তার সেই মারাত্মক কথাগুলো আজও তার বুকে দগদগ করছে । বাসুর কথা শুনতে শুনতে গৌরাঙ্গের চোখ জলে ভরে আসছিল ।

সুধাকে রত্নময়ী জানিয়ে দিয়েছেন —'সুধা যদি সুচারুকে নিয়েই বাঁচতে চায় বাঁচুক , আর কোনো আপত্তি নেই , তবে সে বাঁচার ইতিহাসে যেন কলঙ্ক না থাকে ।'—এখন সুধার আর মনে হয় না মা কিছু অন্যায় বলেছেন । সংসারের স্বার্থপরতা সে অনেক দেখেছে , আজ কি-ছু তার মনে কোনও ঘৃণা বা ক্ষোভ নেই । 'হয়ত ঘৃণা করবে এমন মানুষ আর এ সংসারে নেই ।' সুধার চোখের সামনে মায়ের রূপটি শোষিত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েও মা কতটুকু সুখ পেল ?—আর বাসু ? এতদিন সে ভাইকে বোঝার বি-দুমাত্র চেষ্টা করে নি , আদর করে কোনোদিন বুকে টেনে নেয়নি , নিছক বোঝামাত্র ভেবে এসেছে এতকাল । আজ গভীর সম্পর্কের নিবিড় ব-ধনটুকু মমতা দিয়ে , ভালবাসা দিয়ে , সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছিল সে । যুদ্ধে ভাই-এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় , সে জন্যে সুধা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল । ছোট্ট বোনের উপরেও কোনও ক্ষোভ তার মনের মধ্যে জমা ছিল না । সুধা এখন বাতিল । এবার আরতির পালা । 'সুধা আজ ছোট বোনের জন্যে এই প্রার্থনা করতে পারে , আরতির পরিণাম যেন সুধার মত না হয় ।' সুধা মনে মনে আরও একজনের কথা চিন্তা করছিল । সুচারু-কে । যুদ্ধ-ফেরৎ সুচারু এখন পরিবর্তিত নতুন এক মানুষ —যাকে সে ঠিক যতন বুঝে উঠতে পারছে না ।

> সুচারুকে দেখে তার কথা শুনে সুধার মনে হয়েছে , মানুষটা অনেক একা , সে আলাদা হয়ে গেছে , অনেকের সঙ্গে পথ চললেও দলের বাইরে , পাশে পাশে নিজের মনে হাঁটছে । কেন ? কেন সুচারু এভাবে আলাদা একা হয়ে আছে সুধা বুঝতে পারল না । দুঃখ , আঘাত ? অহংহানির লজ্জা ? বীতরাগ ? বৈরাগ ? কী যে , সুধা জানে না ।

সুচারু সুধাকে জানিয়েছে সে নানাদিক দিয়ে অক্ষম। আশা-শান্তি-বিশ্বাস -এ সব কিছুর ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে অবশিষ্ট নাই। সুধা তীক্ষ্ণ ভাবে উত্তর দিয়েছে এ সব কথা মেনে নিতে তার আপত্তি নাই, কিন্তু তারও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। এতদিন ধরে প্রতীক্ষার দীপ জ্বালিয়ে সে প্রহর গুনেছে, তার কি কোনো দামই নাই? সুচারু কি সুধার ভালবাসাতে বিশ্বাসহীন?

সুচারু বুঝতে পারে সুধা কী বলতে চাইছে? কিন্তু তার সামর্থ্য কোথায়? শরীর এবং মন—দু'দিক থেকেই সে আজকে পঙ্গু প্রায়। এই রকম বাঁচার মধ্যে শান্তি বা সুখ কোথায়? সুধা জানিয়েছে অসুখ থেকে সেও মুক্ত নয়; তা সত্ত্বেও সে আরোগ্যের আকাঙ্ক্ষী, সুচারু না এলে এই আশা হয়তো তার মনে এ-ভাবে ঘনিয়ে উঠতে পারত না।

'এই অনিশ্চয়ের মধ্যে তুমি কেন
শান্তির আশা করছ?'
'জানি না। হয়ত মানুষ জীবনে
শান্তির আশা করে—? সুধা চোখের
পাতা ফেলল, কয়েক মুহূর্ত নীরব
থাকল, বলল, 'আমার কী মনে হয় জান?'
'কী।'
'আমাদের এই সময়টাই বোধ হয় এইরকম।
সবাই ভাঙা, সকলের সমান অবস্থা,
টুকরো—টাকরা হয়ে আমরা আছি,
নিটোল পুতুল কেউ নই। হয়ত তাই
দুই রুদ্ধ দুই খোঁড়া মিলে থাকতে হবে
আমাদের।'
'না থাকলে?'
'আরও দুঃখ। ....তোমায় যদি আমি

আজ আমার কষ্ট অভাব অসামর্থ্য
দিয়ে না বুঝি, তুমি আমায় না বোঝ,
আর কে বুঝবে !'

সুধা নিশ্চিত জানে তার জীবনেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই। তা সত্ত্বেও তাকে পুরোমাত্রায় বেষ্টন করে রয়েছে অফুরান মায়া। এই মায়া জীবনের বৈভব ছাড়া আর কি ? ক্ষত-ক্ষয়িত জীবনের গাঢ় অন্ধকারের ভিতরেও এতদিন সে অপেক্ষায় থেকেছে। আজ সব প্রতীক্ষার অবসান। ফিরে এসেছে সুচারু। সুচারুও ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল যুদ্ধ-মন্বন্তর-দুর্যোগ..ইত্যাদি জীবনকে প্রভাবিত করলেও নিয়ামক কখনই নয়। 'ঘরের এই নিভৃত-রক্ষিত মায়া প্রেম নিষ্ঠা পবিত্রতা এর কোনো মূল্য আছে।' এবং এই জন্যেই আবার ফিরে এসেছে সুচারু। আবার খুঁজে নিয়েছে তার সুধাকে।

সুধার সেই ভাঙা প্রতিমার মতন মূর্তির দিকে
তাকিয়ে অকস্মাৎ সুচারু অনুভব করল, সুধার
কাছে সুচারু যেন জীবনের কয়েকটি মূল্যবান
রত্ন গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, সে অনর্থক এখানে
ফিরে আসে নি, তার গচ্ছিত সম্পদ গ্রহণ করতে
ফিরে এসেছে। এই ভগ্ন জীর্ণ ক্ষতবিক্ষত সিন্দুকের
তলায় সুচারুর সেই বিশ্বাস করে রেখে যাওয়া
রত্নগুলো রক্ষিত আছে। বৃহৎ জগৎ তাকে শূন্যতায়
নিক্ষেপ করেছিল, এই ক্ষুদ্র চার দেওয়ালের জগৎ
যেন তাকে অকস্মাৎ আজ সেই শূন্যতাকেও সহনীয়
করে তুলল।

তিন পর্বে সম্পূর্ণ বৃহৎ উপন্যাস 'দেওয়াল'-এর মধ্যে ঔপন্যাসিক যুগ ও জীবনের যে ছবিটি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে সামগ্রিক ভাবেই অসুস্থতার পরিচয় সুবিস্তৃত। আমরা জানি উপন্যাস শিল্পী বিমল কর মূলত মনস্তত্ত্বলোকের ব্যাখ্যাতা। মানব মনের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি জটিল রহস্যের অনুসন্ধানী।

বৃহৎ পটভূমিকাতে দেশ-কাল প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি তেমনভাবে ভাবিত নন। এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটি কিন্তু অন্যরকম ধারণাকে প্রমাণ করে। উপন্যাসটির মধ্যে তিনি '৩৯–'৪৫ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি সমসাময়িক সমাজ জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্যটিও। আমাদের জানা আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব কীভাবে আমাদের সামাজিক কাঠামোতে আঘাত হেনেছিল; ব্যক্তি সত্তাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। সমগ্র দেশব্যাপী যুদ্ধাতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামের অধ্যায়টিও তিনি তথ্যনিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করেছেন, — সংগ্রামী প্রয়াসের সাফল্য ও দুর্বলতা — দু'দিকেরই পরিচয় সহ। সন্ত্রাসবাদের নৃশংসতা, গান্ধীবাদের বিচ্যুতি, কংগ্রেসি নেতৃত্বের দুর্বলতা, কমিউনিস্টদের চোখে গান্ধী এবং সুভাষের অবমূল্যায়ন ও এম. এন. রায়ের প্রতি বিদ্বেষ —প্রায় কিছুই বাদ পড়েনি। শুধু যুদ্ধের আতঙ্ক বা রাজনৈতিক অস্থিরতাই নয়, প্রকৃতির রোষ: ৪২ -এর সাইক্লোন -বিধ্বংসী বন্যা এবং ৪৩ এর মন্বন্তর বাঙালীর জীবনকে কীভাবে অভিশপ্ত করে তুলেছিল — তার সত্যি বিবরণও ঔপন্যাসিক আমাদের দিয়েছেন।

যুদ্ধ এবং সমাজের এই অস্থিরতা যন্ত্রণা ও আর্তস্বাসের মধ্যে শিল্পী পৌঁছে গিয়েছেন অনেক গভীরে। এক ভয়ঙ্কর দুঃসময় এবং চরম অবক্ষয় কীভাবে একটি পরিবারকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিচ্ছিল, ক্ষতবিক্ষত করছিল তার শান্তি–বিশ্বাস-ভালবাসার মত মূল্যবোধগুলি, এই অবসরে তিনি তা শুনেছেন এবং আমাদের শুনিয়েছেন। যুদ্ধের ভয়ার্ত মুহূর্তগুলি ...নিষ্প্রদীপ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, জাপানী বোমার আতঙ্ক, সাইরেন, মন্বন্তর, দু'মুটো ভাত–একটু ফেনের জন্যে বুভুক্ষু মানুষের মিছিল, সর্বস্তরে চরম দুর্নীতি — ইত্যাদির মধ্যেও উত্তরণের পর্বটি কিন্তু উপেক্ষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে "একটি মানুষের জীবন সমস্যা তাঁর কাছে একটি মহাযুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।[১] তাই আমরা দেখতে পেলাম অসুখের অসহ্য দাহ নিয়েও যে চির-তন হৃদয় চিরকালের মায়াকে সযত্নে লালন করার চেষ্টা করেছে, তাকে তিনি স্বীকৃতি জানালেন। অন্ধকারের মধ্যেও দু'টি মলিন আর্ত অন্তর দ্যুতিময় হয়েছে, নম্র অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বিঘোষিত হয়েছে মানব মহিমা।

সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব ক্রিয়াশীল। যুদ্ধ যে সভ্যতার সঙ্কট— সে কথা নতুন করে বলার কিছু নাই; চমকপ্রদ ঘটনা হল সুচারু সেই যুদ্ধের মধ্যেই নতুন কিছু খুঁজে পাবার প্রত্যাশা করেছিল। সুচারু যুদ্ধে গিয়েছে এবং ফিরেও এসেছে, কি-তু হারিয়ে গেছে তার বিশ্বাস। যুদ্ধ শুধুমাত্র তার অঙ্গ-ই হানি করেনি, মনের মধ্যেও ঘনিয়ে তুলেছে নৈরাশ্যের অন্ধকার। 'কেউ নেই, কিছু নেই সূর্য নিভে গেছে।' (জীবনানন্দ, '১৯৪৬—৪৭')

যুদ্ধকালীন সমাজের যে বাস্তবসম্মত ও মর্মান্তিক পরিচয় আমরা পেয়েছি সেখানে সর্বোতোভাবেই ক্ষয় এবং ক্ষত। চূড়ান্ত নীতিহীনতার মধ্যে মুছে গেছে মানবিক মূল্যবোধ। উলুখাগড়ার মতই ত্রস্ত ও উদ্ভ্রান্ত সাধারণ মানুষ যখন কোনও-রকমে জীবনটা টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অন্য দল তখন নিজেদের উদরকে স্ফীত থেকে স্ফীততর করবার জন্যে অতিমাত্রায় তৎপর। যুদ্ধাতঙ্ক জনিত অসহনীয় অবস্থা ছাড়াও '৪২-এর সর্বনাশা সাইক্লোন-প্লাবণ ও '৪৩-এর মন্বন্তর বাংলার কোমল বুকে এঁকে দিয়েছিল দুঃসহ ক্ষতচিহ্ন। গৃহহীন আর্ত মানুষের কান্না, একমুঠো খাদ্যের জন্যে অসংখ্য জীবন্ত কঙ্কালের আর্তরব আজও আমাদের চোখে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতই।

উপন্যাসটির মধ্যে কংগ্রেসি নেতৃত্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপের বিবরণও প্রকাশিত। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ক্ষমতার লড়াই-এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী এবং বোধ করি তা চিরকালেই।

গিরিজাপতির অতীত জীবনের এক দুঃসহ কাহিনী মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসনাগিনীর উদ্যত ফণার সম্মুখে। মুহূর্তের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়। সন্ত্রাসের নামে আমরা যতই উত্তেজনা এবং আবেগ অনুভব করি না কেন — তার অন্ধকার দিকটি যে কর্ম সর্বনাশা নয় —গিরিজাপতির প্রায়শ্চিত্ত-পর্ব তারই প্রমাণ।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির দিকে আমরা তাকালে বুঝতে পারি তারা প্রায় সকলেই স্থিতিহীনতার মধ্যে অস্থির। শান্তি বা সুস্থিতি মুছে গেছে তাদের জীবন থেকে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে যার যন্ত্রণা এবং বেদনার কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, সেই সুধার জীবনের কারুণ্য পাঠকের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। ফুলের মত একটি প্রাণের অপচয় অসুস্থতার চরম ইঙ্গিতকে নির্দেশ করেছে। সুধা নিঃশেষিত হয়েছে তিল তিল করে। সুখ নাই তার মনে এবং অসুখ তার শরীরেও। সুধার যক্ষ্মা প্রকারান্তরে সমাজ এবং সংসারের ক্ষয়ে যাওয়া রূপটির প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পী মানস আশাবাদী বলেই হয়তো নিভে যাবার আগেও নতুন মায়াতে সমাচ্ছন্ন হয়েছে সুধার মন।

অভাব যে কত ভয়ঙ্কর তা রত্নময়ীর দিকে তাকালেই অনুমান করা যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি রত্নময়ী এবং সুধার ভিতরকার সম্পর্ক দিন-দিন শিথিল হয়েছে। মেয়ের জন্যে মায়ের বুকে স্নেহের অভাব নাই; কিন্তু নিত্য অভাব-দৈন্য সেই স্নেহের মধ্যেও ঢেলে দিয়েছে তিক্ততার গরল।

আরতির জন্মদাত্রী পার্বতীর প্রসঙ্গালোচনায় আমাদের শিউরে উঠতে হয়। মানুষ কতখানি নিচে নামতে পারে —কালিকিঙ্কর তাই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। আরতি যেখানে মানুষ হল, যাদের এতদিন সবচেয়ে আপন বলে জেনে এল, তাদের ছেড়ে নতুনভাবে সব কিছু জানাটা যে কতখানি নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা নাটকীয়ভাবেই কাহিনীর মধ্যে তা ব্যক্ত। বাসুর কথা আরতিকে দীর্ণ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে অসতর্ক বাসুকে দোষ দিয়ে কী লাভ? বরং দোষ দেওয়া উচিত নবলব্ধ পিতৃ-মাতৃ পরিচিতিকে এবং হয়তো অদৃষ্টকেও।

বাসু এই উপন্যাসের অসাধারণ এক জীবন্ত চরিত্র। বাইরে থেকে দেখলে তাকে নির্বোধ, গোঁয়ার, অসভ্য, গুন্ডা—প্রভৃতি অনেক কিছু শব্দেই বিশেষিত করা যায়, কিন্তু সেও যে চরম হতাশার শিকার, মানসিক অসুখ তাকেও যে কুরে কুরে খেয়েছে — তা ভুলে গেলে চরিত্রটির প্রতি অবিচার করা হবে। এই চরিত্রটির ট্র্যাজেডি হল দূর থেকেই তাকে সবাই লক্ষ্য করেছে, ঘৃণা ছিটিয়েছে, কিন্তু কেউ-ই তাকে কাছে টেনে নেয়নি, ভালবেসে অনুপ্রাণিত করেনি।

উমা উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শারীরিক দিকে সে ত্রুটি যুক্ত। আভ্যন্তরীণ সুখহীনতা জনিত বিষাদে সমগ্র পৃথিবী তার কাছে বর্ণহীন মনে হয়েছে।

হারতে-হারতে, ঠকতে-ঠকতে, সে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে — যেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এই অন্ধকার তাকে আত্মহত্যার জন্যে পর্যন্ত ইন্ধন জুগিয়েছে।

অপ্রধান চরিত্রগুলির ভিতরে মীনাক্ষী এবং অবনী সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মীনাক্ষীর বক্তব্যের মধ্যে অকাল বৈধব্যের হাহাকার, অচরিতার্থ জীবনের পিপাসা গোপন থাকে না। আর অবনীর জীবন তো সামগ্রিক ভাবেই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। গিরিজাপতির দৃষ্টিতে সে ক্ষয়িষ্ণু বর্তমানের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অর্থ তার কাছে সাবলীলভাবে বেঁচে থাকা নয়; কোনওরকমে দিনগুলোকে কাটিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ তার কাছে অনিশ্চিত। মৃত্যু-চিন্তাগ্রস্ত তার মন।

গিরিজাপতি প্রবীণ ও ভূয়োদর্শী। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে যখন বিশ্বাসহীনতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসের পবিত্র বোধে তখনও তিনি অবিচল।

দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয় —
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
(জীবনানন্দ, 'সুচেতনা')

সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও নৈতিকতার উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত নন তিনি। অতীতের এক কলঙ্কিত ঘটনার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত চলেছে তাঁর। তা সত্ত্বেও দেখা যায় অবক্ষয়িত পারিপার্শ্বিক, ন্যায়বোধের বিযুক্তি তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তাঁর আত্মকথনের ভিতরে রাজনৈতিক বিচ্যুতির প্রশ্নগুলি ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি জীবনের নেতিবাচক প্রশ্নগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুচারুর যুক্তি তিনি গ্রহণ করেননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন কি?

তেমনভাবে সক্রিয় না হলেও নায়ক হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য সুচারুর জীবনের মধ্যে দুটি পর্বের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ পূর্ব। যুদ্ধোত্তর। প্রথমে সে একরকম ছিল, পরে অন্যরকম হয়েছে। জীবনের প্রতি উৎসাহ একদিন কম ছিল না তার। কিন্তু যুদ্ধ প্রত্যাগত বিচ্ছিন্নতায় সুচারু চরম ভাবেই বিপর্যস্ত। যুদ্ধের বীভৎসতা

তার মন থেকে শান্তি-সুখ সব কেড়ে নিয়েছে। গিরিজাপতির সঙ্গে আলোচনারত যে সুচারুকে আমরা পেয়েছি সেখানে অসুস্থতা ছাড়া কিছুই নাই। সুচারু আমাদের সমাজ কাঠামোতে বহুল প্রচলিত ধারণাগুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ধর্ম-ন্যায় প্রভৃতিতে এখন সে ঘোর অবিশ্বাসী। মানুষের লোভ, রক্ত-তৃষ্ণা, আগ্রাসনে অত্যুৎসাহ— সভ্যতার প্রতিটি প্রহরকে যে ভাবে কলুষিত করে তুলেছে তাতে সুচারু আতঙ্কিত। আশঙ্কাগ্রস্ত কবির মত তারও মনে হয়েছে :

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে ;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।
(জীবনানন্দ ; 'সবিতা')

সুধাকে ভালবেসেও গ্রহণের জন্যে তার যে দ্বিধা-মানসিক দ্বন্দ্ব তার মধ্যে নিজের প্রতি আস্থাহীনতা এবং অ-সুখের ব্যাপক যন্ত্রণা—দুই-ই প্রকাশিত।

এত কিছু সত্ত্বেও শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতায় বিধ্বস্ত সুধা যখন সুচারুর হাতে নিজের শীর্ণ দুটি হাত তুলে দিতে চায়, সুচারুর বুকের মধ্যে ভালবাসার প্রতিধ্বনি শোনে, — সুচারু তখন বুঝতে পারে ঘর এবং বাইর এক নয়। দুর্ভেদ্য ঘর অনেক সময়েই বাইরের সংক্রমণ আক্রমণকে প্রতিহত করে থাকে, আমাদের মনে স্বস্তি জাগায়। সুচারু বুঝতে পারে অনেক কিছু হারানো সত্ত্বেও — চরম অসুস্থতার শিকার হয়েও জীবনে এমন কিছু আছে, যাকে নিয়ে বেঁচে থাকা যায়, এবং সেখানেই জীবনের সার্থকতা।

সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—আছে আছে আছে এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ন হৃদয় ; —
জয় অস্তসূর্য, জয়, অনন্ত অরুণোদয়ের জয়।
(জীবনানন্দ, 'সময়ের কাছে')

'ছোট ঘর' আমাদের ক্লান্ত করে। 'ছোট মন' আমাদের সত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে চায়। তবুও বাঁচার মায়াতে আমরা প্রাণিত হই। এবং সেই মুহূর্তে 'খোলা জানলা' দিয়ে মুক্তির আশ্বাস আছড়ে পড়ে ঘরের চার 'দেওয়াল'-এ। একই সঙ্গে নতুন করে বেঁচে ওঠে জীবনের নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বপ্নও।

'খড়কুটো' (১৩৭০) উপন্যাসটি সংবেদনশীল ঔপন্যাসিকের অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের নিদর্শন। উপন্যাসের সর্বত্র তাঁর বিষণ্ণ ও রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। উপন্যাসে শিল্পী যে ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছেন —সে দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে খড়কুটো মুখে নিয়ে দুটি পাখি তাদের নীড় গড়ে চলেছে। সেখানেই রয়েছে তাদের আশ্রয় আর ময়তার উষ্ণতা। ভালবাসা আর সুখের কলরবে মুখর হয়ে আছে সেই বাসাটুকু। কি-তু কখনও বা ঝড় ওঠে। দুর-ত সে ঝড়। কেঁপে ওঠে স্বপ্নের সেই নীড়। দুটি জ-তর তখন আঁকড়ে ধরতে চায় পরস্পরকে। এতদিনের ক্লান্তিহীন প্রয়াসে যে স্বপ্নের জ-ম তারা দিয়েছে, এ-ভাবে অবসান ঘটতে পারে না তার। সব কিছু তবু ভেঙে ছত্রখান। আকস্মিক মত্ততার তা-ডবে কোথা দিয়ে কী ঘটে যায়। ঝড়ের প্রচ-ড দাপটে একজন বুঝি হারিয়েই গেল। তবুও তার জন্যে আর একজনের প্রতীক্ষা করে থাকা। আকুল অন্বেষণ। বুকের মধ্যে লালিত হয়ে চলে স্মৃতির বারতা।

'খড়কুটো' উপন্যাসে দুটি মুখ্য চরিত্র —ভ্রমর ও অমল। দু'জনেই দু'জনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল সুখের আশ্বাস। দু'জনের ভাললাগাই একদিন পাপড়ি মেলেছিল ভালবাসার ফুল হয়ে। যাবতীয় রুগ্নতা আর বিষাদকে তুচ্ছ করে ঈশ্বরের প্রতি নিঃসংশয়িত বিশ্বাস আর অবিচলিত আস্থায় ভ্রমর নিজের জাগরণকে প্রত্যক্ষ করেছিল অমলের মধ্যেই। কি-তু ভয়ঙ্কর অসুখের কালো ছায়া সমস্ত উজ্জ্বলতাকেই ম্লান করে দিতে চায়। অসহ্য ব্যথা বুকে নিয়েই অমল দিন গুণে চলে। সে জানে না— ভ্রমর তার কাছে কবে ফিরে আসবে, অথবা আদৌ ফিরে আসবে কিনা —তাও তার অজানা। দুরারোগ্য অসুখ কবলিত ভ্রমরকে তবুও অমল ভুলতে পারবে না, তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন। তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। অমল অপেক্ষায় থাকবে।

উপন্যাসটির মধ্যে শুধুমাত্র অসুখের উপমা-ই নাই, একই সঙ্গে রয়েছে ভালবাসার অমোঘ শুশ্রূষা, রয়েছে করুণাময় যিশুর চরণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। ভ্রমরের দুখী জীবনে অমলের উপস্থিতি মুক্ত বাতাসের মতই। যে পরিবেশের মধ্যে ভ্রমর হাঁফিয়ে উঠেছিল, অমল তার মধ্যেই আনন্দের জোয়ার এনেছে। এই পৃথিবীর

যে এত ব্যাপ্তি ও সৌন্দর্য – তা অমলের কাছ থেকেই ভ্রমর বুঝতে শিখেছে। প্রকৃতপক্ষে একটি অমল হৃদয়ের ছোঁয়ায় ভ্রমর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে শিখল। ভালবাসা ভ্রমরকে আরও সুন্দর করল।

আনন্দমোহন, হিমানী, কৃষ্ণা আর ভ্রমরদের সংসারে অমল অতিথি-আত্মীয়। আনন্দমোহন সম্পর্কে তার মেসোমশাই। উদ্বেগের সঙ্গে অমল লক্ষ্য করেছে হিমানী মা এবং কৃষ্ণার সঙ্গে ভ্রমরের মানসিক ভাবে বিরাট ব্যবধান। তা-ছাড়া ভ্রমর সম্বন্ধে আনন্দমোহনের উদাসীনতাও দুর্লক্ষ্য নয়। ভ্রমর সকলের থেকেই আলাদা। সব থেকে সুন্দর ফুলটির দিকেই যেন নজর নেই কারও। ভ্রমরের প্রতি সকলের অবহেলা অমলের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অমল কিন্তু খুব সহজেই দুখী অসুস্থ মেয়েটিকে আপন করে নিয়েছে, মুছিয়ে দিয়েছে ওই বিষাদ-প্রতিমার বেদনাশ্রু। নিবিড় মমতায় একান্ত আপন করে নিয়েছে তাকে নিজেরই বুকের মধ্যে। অসুস্থতা ভ্রমরের মত মিষ্টি মেয়েটির জীবনী শক্তিকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে তুলেছে। চিকিৎসা, ওষুধ-পত্তর সব কিছুই ঠিক-ঠাক ভাবে চলছে, কিন্তু এ সব ব্যাপারে কেউ-ই তেমন উদ্বিগ্ন নয়। হিমানী মার মনোভাবের মধ্যে নিয়ম-কানুনের উপদেশ যতটা আছে, ততটাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আন্তরিকতার উষ্ণতা। মাতৃহারা ভ্রমর কিন্তু তার মা সুখতারার মত মরে যেতে চায় না। অসুখের মধ্যেও তাই সে বাঁচবার আগ্রহে আকুল হয়। বলা বাহুল্য, – এই ব্যাকুলতা ভ্রমরের মধ্যে সঞ্চার করেছে অমল।

ভ্রমর প্রতিমার মত দেখতে, কিন্তু শারীরিক সংস্থানগত ত্রুটি থেকে সে বিমুক্ত নয়। 'ভ্রমরের বাঁ পা একটু ছোটো, মোটা গোড়ালিঅলা জুতো পরে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটে।' অমল ভ্রমরের সঙ্গী হয়ে তার হাত ধরে হাঁটতে চেয়েছে। কারণ তার মনে হয়েছে, —

> দু'পায়ে যার সমান জোর নেই, তাকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত, কোথাও কিছুতে পা বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে।

প্রায়শই জ্বর আসে ভ্রমরের। ভ্রমর কিন্তু তা গোপন রাখতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অমল বাজী পোড়ানো দেখে ফেরার পথে জ্বর নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করলে —ভ্রমর তাকে বাড়ি ফিরে জ্বরের কথা বলতে নিষেধ করেছে ।

অমল অবাক হল ।"কেন ? জ্বর হলে কি তুমি লুকিয়ে রাখো ? "

"সব সময় বলি না । যা পছন্দ করে না ।"

"বা । অসুখের আবার পছন্দ কি – ? "

"কি জানি । মা আমার অসুখ শুনলে রাগ করে ।"

অনুশাসনের শুষ্ক বালুভূমিতে বাৎসল্যের সস্নেহ ধারা সম্পূর্ণরূপেই অন্তর্হিত । ভ্রমর বাড়ির এক জনের উপরেও নির্ভর করতে পারে না, ভরসা খুঁজে পায় না । অমল ভ্রমরের মুখ থেকে বিশদ ভাবে সব কিছু জেনে নিতে চেয়েছে, —

"তোমার কি প্রায় অসুখ করে ? "অমল শুধলো ।

"করে । আগে করত না; আজকাল মাঝে-মাঝেই করে ।"

"কি অসুখ ।"

"কে জানে, কি অসুখ ?"

"ডাক্তার দেখাও না ? "

"বেশী হলে দেখাই । বাবা বলেছিল আমায় জব্বলপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাবে ।"

ভ্রমরের মা মারা যাবার পর তার বাবা হিমানী মা আর কৃষ্ণাকে নিয়ে এল । ভ্রমরের খুব দুঃখ হত । সে ভালবাসতে চাইত সকলকে, কিন্তু তেমনভাবে যেন ভালবেসে উঠতে পারত না । মানসিকভাবে সে ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল । এই নিঃসঙ্গতা-বিষাদ তার অসুখকে আরও প্রশ্রয় দিয়েছে । ভ্রমর জ্বরে আক্রান্ত, কিন্তু এ ব্যাপারে কৃষ্ণা বা মাসীমার কোনও আগ্রহ নাই । মর্মাহত অমল বুঝতে পারে কেন ভ্রমর তার অসুস্থতাকে গোপন রাখতে চায় । ভ্রমরের ঘরে প্রবেশ করে অমল চমকে উঠেছে । বিশীর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা তার । মুখ তোলে ভ্রমর, —

সারা রাতের জ্বরে মুখ যেন পুড়ে শুকিয়ে গেছে ভ্রমরের । চোখের চারপাশ টসটস করছিল,

পাতলা ঠোঁট দুটিতে যাতনা মেশানো।
ক্লান্ত অবসন্ন চোখ তুলে ভ্রমর অমলকে
দেখল দু'পলক। তারপর অসুস্থ অবশ
হাতে কোমর থেকে লেপ আরও একটু
উঁচুতে তুলে নিল। নিয়ে কেমন বিব্রত
ভঙ্গিতে এলোমেলো কাপড়টা গায়ে গুছিয়ে
নিল।

ভ্রমরের জন্যে অমলের মন খারাপ করে। ওকে অন্যমনস্ক ও উদাস দেখায়। ভ্রমর ভাবে অমল বুঝি বাড়ির কথা ভাবছে। অমলের ভাবনাতে বারবার ভেসে ওঠে একটি সুন্দর দুঃখী শান্ত মুখ।

ভ্রমরের মুখটি ছোট, কপাল সরু, গাল
দুটি পাতার মতন; চিবুক একেবারে প্রতিমার
ছাঁদ। রঙ শ্যামলা। ঘন টানা টানা ভুরুর
তলায় কালো কালো ডাগর দুটি চোখ। পাতলা
নাক, পাতলা ঠোঁট। মানুষের মুখ দেখলে
এত মায়া হয়—অমল জানত না। ভ্রমরের মুখ
দেখে অমলের কেন যেন মনে হয়, এমন মুখ
আর সে দেখে নি। ফুলের মত ভাল।

ভ্রমরের মাঝে-মাঝেই জ্বর হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা,—এই সব নিয়ে অমলের চিন্তা ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। আচমকা সে একদিন আনন্দমোহনকে বলেও ফেলে "মেসো-মশাই, ভ্রমরের কোন অসুখ করেছে।" অসুখ প্রসঙ্গে ভ্রমরের ঔদাসীন্যও অমলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

অসুখ হলে বলব না, জ্বর হলে থার্মোমিটার
দিয়ে জ্বর দেখব না, শরীর দুর্বল হবে,
রাস্তায় মাথা ঘুরবে, কথা বলতে হাঁফিয়ে
পড়ব—তবু কাউকে কিছু বলব না—ভ্রমরের এই
স্বভাব অমলের ভাল লাগে না। অমল বলল,

"ভ্রমর তোমার যদি সব সময় অসুখ হয়
তুমি বাঁচবে কি করে ।" বাঁচব কি করে ।
মা'র কথা ভ্রমরের মনে পড়ল । হিমানী
মা'র মুখেই ভ্রমর শুনেছে, তার মা'র নাকি
সব সময় অসুখ লেগে থাকত ।

ভ্রমরের মায়ের নাম ছিল সুখতারা । কি-তু নামের সঙ্গে মানুষটির মিল ছিল না । সুখহীনতার যন্ত্রণায় সুখতারা বড় ম্লান ছিল । ভ্রমরের মধ্যেও হয়তো এই অ-সুখের বোধ পরিব্যাপ্ত হয়েছে । রোগের এত কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যেও ভ্রমরের মনে আস্তিক্যবোধ প্রবল । তার মতে ভগবানকে পরীক্ষা করতে নাই ; তিনি সকলের মধ্যেই রয়েছেন, নিত্যই সেই মঙ্গলময়ের অধিষ্ঠান । ভ্রমর বলে, —

"যীশু নিজের জন্যে কিছু চান নি,
সকলকে তিনি ভালবেসেছিলেন । তবু
কষ্ট দিয়ে মানুষ তাঁকে মেরেছিল ।
... আমরা বড় নিষ্ঠুর । ভালবাসা
জানি না ।"

ভ্রমরের এই পবিত্র সরল বিশ্বাসী রূপকে অমল সঠিক ভাবে চিনে উঠতে পারে না । না বুঝতে পারুক, তার মনে হয় —ভ্রমর অনেক বড়, অনেক কিছু বেশিই জানে সে ।

তখন অমলের মনে হল, ভ্রমর ঠিকই বলেছে,
সমস্ত মানুষ যদি ভাল হয়, আমরা সকলে
সকলকে যদি ভালবাসতাম, তবে সবাই সুখী
হত । ভ্রমরকে কেন হিমানী মাসী ভালবাসে
না, কেন কৃষ্ণা তার দিদিকে খুব ভালবাসে
না ? এ বাড়ির সকলে যদি ভ্রমরকে ভালবাসত;
তবে ভ্রমর দুঃখী হত না, তার অসুখ থাকত না।
ভালবাসা পেলে অসুখ থাকে না —এই আশ্চর্য
কথাটা অমলের মাথায় আসার পর সে নিজেই

কেমন অবাক ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকল ।

অমলকেও ভ্রমরের খুব কাছের মানুষ মনে হচ্ছিল । অমলের সহানুভূতি -মমতা ভ্রমরকে ভরিয়ে দিচ্ছিল , ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক অনুভূতিলোকে । অমলের মধ্যেই ভ্রমর খুঁজে পেয়েছিল ভুলে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ দিয়ে ঘেরা নিবিড় ভুবনটিকে ।

> ভ্রমর আজ শুয়ে শুয়ে অমলের এই মায়া মমতা ও করুণার কথা ভাবছিল । মনে হচ্ছিল , এতদিন সে যেন বাইবেলের সেই ডুমুর গাছ হয়ে ছিল । অফলা ডুমুর গাছ । একটি ফল ফলত না কোনদিন। তাকে হিমানী মা'রা হয়ত কেটে ফেলত । কি-তু অমল এসে তার চারধার খুঁড়ে যেন সার দিয়ে দিয়েছে ।

বাঁচার কথা ভাবতে গিয়েই ভ্রমরের মনে পড়ে যায় তার মাকে । মা অসুখের ধাত পেয়েছিল বলে বাঁচেনি। কি-তু সংসারের ভালবাসাতেও তার কোন ভাগ দিল না । ভালবাসা পেলে হয়তো সে বাঁচত । ভ্রমর কি-তু বাঁচতেই চায় , ফলও ডুমুর গাছটির মতন । ভ্রমর গলার হারে গাঁথা ক্রুশটি স্পর্শ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায় ।

> তার এ সময় হঠাৎ মনে হল , ভালবাসাই মানুষকে বাঁচায় । যে অন্ধজন , যে কুষ্ঠরোগী এবং অন্য যারা যীশুর কৃপায় আরোগ্যলাভ করেছিল , তারা তাঁর ভালবাসার বলে অসুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছিল । ভালবাসাই আরোগ্য ; বিশ্বাস এবং ভালবাসাই সব । ভ্রমর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চাইল , সে এই অসুখ থেকে উদ্ধার পাবে , এবং বিড়বিড় করে ভ্রমর বলল : ভয় পেয়ো না , বিশ্বাস কর ।

ভালবাসার চিন্তায় ভ্রমর এখন ব্যাকুল । অমলের সঙ্গ —তার সহমর্মিতা ভ্রমরকে নতুনভাবে আলোড়িত করেছে ।

সে কাতর হয়ে অমলের মনের পাশে গিয়ে বসতে চাইল ; যে চোখে অমল দেখছে , যে মনে অমল ভাবছে , যে স্বভাব নিয়ে অমল এত সুন্দর—ভ্রমর সেই চোখ মন স্বভাব সব কিছুর অংশীদার হতে চাইছিল । একজন মানুষ কখনও অন্য একজন মানুষের মধ্যে গিয়ে মিশে যেতে পারে না । যদি পারত , ভ্রমর হতাশ হয়ে এবং আক্ষেপ করেই ভাবছিল , যদি সে অমলের মনের মধ্যে ডুবে যেতে পারত , ওর সব কিছুর সঙ্গে মিশে যেতে পারত তবে সে ধন্য ও পূর্ণ হত ।

ভ্রমর জানে সব প্রার্থনায় আনন্দ থাকে না । কিন্তু জ্বরাক্রান্ত শরীরেও সে আনন্দময় প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হতে চাইছিল না । প্রভুর কাছে তার প্রার্থনা নিজের এবং অমলের জন্যে । এই ভাবেই সে সমস্ত অ-সুখের গ্লানিকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিল । নতুন চিন্তা-নতুন ভাবনার আনন্দকে ভ্রমর অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুতে পৌঁছে দিতে চায় , এমন সময়েই কিন্তু প্রচন্ড ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল সে ।

বাড়িতে ডাক্তার এসেছিল । ভাল করে দেখে শুনে এক গাদা ওষুধপত্র ইনজেকশন দিয়ে গেছে । ভ্রমর খুব অ্যানিমিক হয়ে গেছে ; অ্যানিমিক হয়ে পড়ায় ও এত দুর্বল , ওর সামান্যতেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে ; লিমফ গ্ল্যান্ড ফুলেছে । সাবধানে থাকা , ওষুধপত্র খাওয়া বিশ্রাম এবং দুধ ফল শাক-সব্জির পথ্য পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার চলে গেছে । তার কম্পাউন্ডার বাড়ি বয়ে এসে ইনজেকশান দিয়ে যাচ্ছে ভ্রমরকে । একদিন অন্তর আসে ।

ভ্রমরের অসুখে অমল ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে । তার বাইরে বেড়াতে আসার আনন্দটা সম্পূর্ণই মাটি হয়ে গেছে । ভ্রমরের জন্যে অমলের মনে যে অনুভূতি—তাতে মায়া এবং বেদনা ।

ভ্রমরকে আজকাল দেখলেও বড় মায়া হয় ।
সমস্ত মুখটি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, যেন
গালে মুখে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই ।
ভীষণ শুকনো দেখায়, খড়ি-ওঠা-ওঠা ।
লাবণ্য নিভে যাচ্ছে । শীর্ণ প্রাণহীন চেহারা
হয়ে এসেছে, হাত দুটি রোগা, আঙুলগুলো
নিরক্ত । ভ্রমর যে এত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে
গেছে অমল বেশ বুঝতে পারে । শুধু চোখ দুটি
এখনও টলটল করছে ।

এত কিছু সত্ত্বেও অমলের মনে হচ্ছিল ভ্রমর ভাল হয়ে উঠবে । এত অসুখের ভিতরেও অমলের শুধুই মনে হচ্ছিল ভ্রমর বড় মধুর—বড় সুন্দর । সে সেরে উঠলে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে । অমলের মমতামাখা ভালবাসা ভ্রমরকে ভাসিয়ে দিয়েছে । সান্ত্বনার একমাত্র আশ্রয় হিসাবেই সে অমলকে বেছে নিয়েছে । 'অমল আদর করে, মায়াবশে, ভালবেসে' ভ্রমরকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে গেলে ভ্রমরও অমলের বুকে মুখ লুকিয়েছে । ভ্রমর এই মুহূর্তে আত্মসমর্পিতা ।

ওরা পরস্পর উভয়ের হৃদয় অনুভব করে
আজ দুটি গাল জোড়া করে, দুটি মুখ একত্র
করে এবং ওষ্ঠ স্পর্শ করে কোনো গভীর
অবিচ্ছিন্ন রহস্যময় আনন্দ অনুভব করছিল ।

অসুখের মধ্যেও প্রেম এই মুহূর্তে তিমির বিনাশী শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে :

প্রেম
ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রতিতি
(জীবনানন্দ, 'অনেক নদীর জল')

'ভালবাসাই আরোগ্য', —এই বিশ্বাসে ভ্রমরের মন ভরে উঠেছিল । ভালবাসার আনন্দ, অমৃতধারার সিঞ্চন যে জগৎ ও জীবনকে অপরূপ করে গড়ে তোলে সে সম্বন্ধে ভ্রমরের মনে কোনও সংশয় ছিল না । তার মনে হচ্ছিল এই আনন্দে অসুখের কালো ছায়াও

আস্তে, আস্তে দূরে সরে যাবে । ভ্রমর তার বাবার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, কারণ তার মায়ের দুঃখ । তাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তার বাবা হিমানী মা এবং কৃষ্ণকে ঘরে এনেছিল । হিমানী মা এবং কৃষ্ণ সকল সময় নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, বড় আত্মসুখী তারা । তবুও ভ্রমর সকলকে ভালবাসতে চেয়েছে । প্রভু যিশুর কাছে ভালবাসার মন চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে । আজ অমলকে ভালবাসায় ক্ষত বুকে দেবদূত মনে হচ্ছিল তার । এই দেবদূতটি তার সকল ব্যথা দূর করে দেবে । তার আঁধার মনে প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠবে ।

এত নিবিড়তা, নৈকট্যের বিহ্বল রহস্য, — তার ভিতরেও অজানা কোনও আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে দু'জনের মন । দু'দিন পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পালা তাদের । আবার সেই গতানুগতিক জীবনের ছক ; ভালবাসার স্নিগ্ধতা বিহীন আরোগ্যের ব্যবস্থা, অ-সুখের যন্ত্রণা । ব্যথাতুর হয়ে ওঠে মন :

> মনে হল, কোনো অনন্ত সমুদ্রের আলো-ঘরে
> দুটি পাখি বসে আছে । তারা আজ অতি ঘনিষ্ঠ ।
> কিন্তু তাদের কাল সকালে ভিন্ন পথে উড়ে যেতে
> হবে । চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতন একটি আকাঙ্ক্ষা
> ঘনিয়ে উঠল ঘরে । অমল মুখ হাঁ করে শ্বাস
> ফেলল ।

অমলের উপস্থিতিতে ভ্রমরের কাছে সব কিছুই সৌন্দর্যময় । গতবারেও ক্রীশমাস এসেছিল, কিন্তু এবারের মত তাতে ছিল না অফুরন্ত সুখের প্রবাহ ।

> এবারে এত রোদ এত আলো । এত হাসিখুশি
> হয়ে ক্রীশমাস আসবে কে জানত । হয়ত ভ্রমরের
> সমস্ত জীবনে এই প্রথম এক ক্রীশমাস এল, যার
> সুখ সে আর কখনও অনুভব করে নি ।

ভ্রমর নিবিড় কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে — "হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না"... ভ্রমরের কাছে এই সখা ভগবান এবং অবশ্যই অমলও ।

পৃথিবী জোড়া অসীম রূপৈশ্বর্য, মনের অপরিসীম মধুরিমা, জীবনের এই

অপরিমেয় উষ্ণ আবেগ, — সব কিছুর মধ্যেও কি-তু আবার সেই বিষণ্ন চিন্তার মেঘ, অসুখের অশনি সঙ্কেত।

> ভ্রমরের অসুখের কথাটা বাস্তবিক তারা কেউ
> ভোলে নি, চাপা দিয়ে রেখেছিল। সুখের
> দিনে দুঃখের চিন্তা করতে কারুর ইচ্ছে হয় নি।
> নয়ত মেসোমশাইয়ের মতন অমল এবং ভ্রমরও
> মনে-মনে জানত, এই ক্রীশমাসের ছুটিতেই
> তাদের আলাদা হয়ে যাবার কথা, একজন
> যাবে ডাক্তার-ওষুধের জিম্মায়, অন্যজন আর
> মাত্র কদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবে।

ভ্রমরকে পরীক্ষা করতে এসেছেন মজুমদার ডাক্তার। তীব্র দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটি তিনি পরীক্ষা করতে থাকেন ভ্রমরের অসুখ।

> মজুমদার ডাক্তার ভ্রমরের হাত সামনে টেনে নিয়ে
> এসে আস্তে-আস্তে মণিবন্ধের খানিকটা ওপরে,
> ভেতর দিকের হাতের মাংসের ওপর যেন খুব
> আলতো করে আঙুল বোলালেন, বোলাতে-বোলাতে
> হঠাৎ নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে ক্যারামের গুটি
> মারার মতন জোরে মারলেন মাংসের ওপর, মেরে
> তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পর-পর,
> থেমে-থেমে এই রকম চলল ক'বার, কখনও
> আঙুলের ঠোক্কর, কখনও চিমটি কাটার মতন
> মাংস টেনে দিলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা,
> এবার তুমি যাও।"

পরীক্ষা করার পরে ডাক্তারবাবু নাগপুর যাওয়ার উপরেই জোর দিলেন। 'এ রকম কেস' হাতে রাখতে রাজি নন তিনি। আনন্দমোহন মনে করেছিলেন নিছক অ্যানিমিয়া। ডাক্তারবাবুর অভিমত, —

"কি-তু ক্রনিক অ্যানিমিয়া ভাল না। আমি বোধ হয় গত এক-দেড় বছর ধরে ভ্রমরের ট্রিটমেন্ট করছি। কখনও এটা, কখনও ওটা লেগেই আছে। ওষুধপত্রে অ্যানিমিয়া একটু কমে, ক'দিন পরে আবার, খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠেছে। ডাক্তার খানায় ওর সব ব্লাড রিপোর্ট -টিপোর্ট আমি কালও দেখেছি। বেটার টু টেক সাম গুড অ্যাডভাইস।"

মজুমদার ডাক্তারের সন্দেহ রোগটা 'লিউকোমিয়ায়' গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

"রোগটা খুব খারাপ, খুব ভয়ের রোগ, এ ডিজিজ অব ব্লাড : ব্রেকিং অফ রেড ব্লাড সেলস্"— মজুমদার ডাক্তার সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে পা দিয়ে নিবিয়ে দিলেন। দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলার মতন করে বললেন, "ক্রনিক অ্যানিমিয়া, এনলার্জমেন্ট অফ দি স্প্লীন্ অ্যান্ড লিম্ফ্যাটিক গ্লান্ডস মোটেই ভাল না।" চোখ ফিরিয়ে মজুমদার ডাক্তার এবার অত্যন্ত সহানুভূতিবশে আনন্দমোহনের দিকে তাকালেন, আস্তে আস্তে বললেন, "বিশ্বাস দা, আপনি আমার সুজাতি, আমরা প্রবাসে রয়েছি, যদি আমার হাতে আপনার মেয়ের কিছু মন্দ হয়ে যায়, সে আফসোস আমার যাবে না। আমি রিস্ক নিতে রাজিনা। আপনার মেয়ে, গেলে আপনারই বেশী যাবে। আপনি নাগপুরে যান, আমি ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছি, চিঠিপত্রে লেখালেখি করেছি।... হয়ত আমারই

ভুল হচ্ছে রোগ বুঝতে । তবু যান একবার
দেখিয়ে আসুন —"

অমল সব কিছু শুনে অসার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল । এখন তার কাছে সব কিছুই ফাঁকা-অর্থহীন । ভ্রমর যে কঠিন রোগের শিকার—সেটা না বোঝার কোনও কারণ নাই । এমনকী তার বাঁচা -মরার ব্যাপারে পর্যন্ত ডাক্তারবাবু সঠিক ও সরাসরি উত্তর দিতে পারলেন না । অমল আর ভাবতে পারছিল না — না কি ভাবতে চাইছিল না । নতুন বছরের প্রথম দিনটিই অমলের কাছে শূন্যতার খবর বয়ে নিয়ে আসবে । অমলকে শূন্য করে চিকিৎসার জন্যে নাগপুর রওনা হবে ভ্রমর ।

অমল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল । যেন সে
ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার
অজ্ঞাত অতি দূর কোনো শহরের একটি ভীষণ
স্তব্ধ নির্জন একটি কক্ষ দেখছিল। ভ্রমর
বড় হাসপাতালের সাদা কনকনে বিছানায়
শুয়ে আছে । তার লাল রঙ কণাগুলি প্রতি
মুহূর্তে যেন ফুরিয়ে আসছে । অমলের মুখ
কেমন ভেঙে আসছিল । কান্না এসে তার গাল
ও ঠোঁটের মাংস কুঁচকে দুমড়ে দিচ্ছিল ।
ঠোঁট কাঁপছিল ।
ভ্রমর বলল , "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত
তুমি থেকো , থাকবে না ? "
মাথা হেলিয়ে অমল বলতে যাচ্ছিল ,
হ্যাঁ , সে থাকবে , কি-তু তার আগেই অমল
ছেলেমানুষের মতন কেঁদে উঠল ।

ভ্রমর চিকিৎসার জন্যে নাগপুর যাচ্ছে ; কি-তু সে জানে না তার অসুখ কত মারাত্মক । তবে সন্দেহ তার হয়েছে । তাই অমলকে সে বলেওছে , 'আমার এক একবার মনে হচ্ছে , আমার খুব কঠিন অসুখ ।' অমল বিষণ্ন ভ্রমরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে , চেষ্টা করে নিজেকে সামাল দিতে । ভ্রমর বাইবেল থেকে গল্প শুনিয়েছে অমলকে , লাজারের গল্প । লাজারের মৃত্যু হলেও প্রভু যিশু চারদিন পরে তাকে

বাঁচিয়ে তুলেছিলেন । অমল মনে করে এ সব মিছক গল্পই, কি-তু ভ্রমর তা মানতে নারাজ ।

"গল্প কেন । ... তুমি কিছু বিশ্বাস কর না ।
ভগবানকে যে ভালবাসে সে মরে না,
ভগবান তাকে বাঁচান ।"...
অমল কিছু বলল না । ভগবান কি সত্যি এত
দয়ালু । অমল কেমন বিতৃষ্ণা এবং রাগের সঙ্গে
ভাবল, ভগবান এত দয়ালু বলেই কি তোমায়
অসুখে ভোগাচ্ছেন ? কেন তোমার মা নেই ভ্রমর ?
কেন হিমানী মাসী তোমায় এতকাল অযত্ন করে
এসেছেন ? অমল ভগবানের ওপর রাগ এবং ঘৃণার
চোখ করে তাকাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হঠাৎ
কোথায় বাধা পেল, ভয় পেল । তার মনে হল,
কি দরকার, ভ্রমর হাসপাতালে যাচ্ছে, ভগবান
দয়ালু হোন নাহোন, নির্দয় হতে পারেন, যদি
তিনি অসন্তুষ্ট হন, ভ্রমরের ক্ষতি হতে পারে ।
অমল আর ও-বিষয়ে ভাবতে চাইছিল না ।

বিদায়ের বিষাদ-লগ্ন । বিচ্ছেদ আকুল যাত্রা-পথ । অমল উদাস এবং দীর্ণ । ভ্রমরকে ছাড়া সে থাকবে কী করে ? ভ্রমর সান্ত্বনা দেয় । সে তো আবার ফিরে আসবে, তখন সব দুঃখের সমাপ্তি । অমল শক্ত করে ভ্রমরের হাত ধরে থাকে । সে ভ্রমরের কাছ থেকে সরে যেতে চায় না । ভ্রমর এক বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে অমলের স্পর্শকে অনুভব করে । পরিপূর্ণ তার উপলব্ধি । সেই মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যায় বিচ্ছেদের ঘনীভূত বেদনা । তার মনে হয় দুঃখকে কেউ চায় না, কি-তু তা আছেই । আবহমানকাল ধরেই তার বিস্তার । ভ্রমর সরল এবং গভীর বিশ্বাস নিয়ে বাইবেলের কথা অমলকে শোনায় ।

"তোমার দুঃখ হবে, কি-তু দুঃখই একদিন
আনন্দ হয়ে দেখা দেবে । যীশু বলেছিলেন,

এখন দুঃখ সও, কিন্তু আমি আবার এসে
তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন সুখী
হবে।''

অমল চুপ করে শোনে, কিন্তু এখন ও সব মেনে নিতে সে রাজি নয়। ভ্রমরের অসুখ এখন, অমলের চোখে তাই সমগ্র পৃথিবীর অসুখ ধরা পড়ে। ভ্রমর না ভাল হয়ে উঠলে সে মরে যাবে। 'যন্ত্রণায়, কান্নায়, আবেগে, হাহাকারে' সে ভেঙে পড়ে। ভ্রমরকে তুলে দিতে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল অমলের। ভ্রমর বলেছিল 'দূরে যে থাকে তাকে অবিশ্বাস করতে নেই।' তাঁকে দেখা যায় না, তবুও ভাবার দরকার।

অমলের মনে পড়ে গেল কথাটা। ভ্রমর বলেছিল একদিন, সব ভাল জিনিসই দূরের, অনেক দূরের। ভগবান দূরে থাকেন। ভালবাসাও বোধ হয় ভগবানের মত দূরে থাকে। অমল মুখ তুলে ভ্রমরকে দেখল। চাঁদের অমল মলিন আলোতেও ভ্রমরের মুখ হিমেভেজা ফুলের মতন দেখাচ্ছে, ক্ষীণ শীর্ণ কিন্তু পবিত্র, মলিন অথচ সুন্দর। ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে অমলের মনে হল, ভ্রমরের দুঃখ হচ্ছে, সে কাতর কিন্তু তার ভয় নেই; দ্বিধা নেই, সে জানে সে ফিরে আসবে। যেন তার অসুখ সত্যিই বাইবেলের লাজার-এর মতন; মৃত্যুতে যার শেষ নেই সত্যিই ভগবানের মহিমার জন্যে এই অসুখ।

ভ্রমর জানায় — 'আবার আমি ফিরে আসব'। তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অমল ফিরে আসছিল। তার শুধুই মনে হচ্ছিল ভালবাসার মত পবিত্র অনুভূতি পৃথিবীতে নাই, এই অনুভূতির সন্ধান তাকে দিয়েছে ভ্রমর নামের ওই নিষ্পাপ সুন্দর মেয়েটি।

ভালবাসা যে কতটা দেয় অমল এই মুহূর্তে তা অনুভব করতে পারছিল, তার মনে হচ্ছিল,

সুখের সমস্তটা এই ভালবাসা—বাঁচার
সবটুকু এই ভালবাসা — ভাল লাগার
যা কিছু ভালবাসার মধ্যে । ভ্রমর
ঠিকই বলত, 'আমরা বড় নিষ্ঠুর,
ভালবাসা জানি না ।'

অমল কিন্তু ভালবাসার ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলতে চায় না । তাই ভ্রমরের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে । সে প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবে। সে ভ্রমরকে ভাববে ।

উপন্যাসটির মধ্যে অসুখের উপমা অনুসন্ধান করতে গিয়ে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সঙ্কটও অপ্রকাশিত থাকে না । একই সঙ্গে অবশ্য লক্ষণীয় জীবনের এক পরম সত্যের স্পষ্ট উদ্ভাসনও । আস্তিক্যবোধ এবং ভালবাসায় গভীর বিশ্বাস কাহিনীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে পবিত্র অনুভূতির দ্যুতি ।

আলোচনাকালে আমরা দেখি উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভ্রমর, ফুলের সঙ্গেই যার যথার্থ উপমা । এই ভ্রমর কিন্তু বিষাদের প্রতিমা । মানসিক বেদনা আর শারীরিক অসুখ তাকে তিল তিল করে নিঃশেষ করেছে । শরীরে তার সুখ — সুখ নাই মনেও । মাতৃহারা ভ্রমর হিমানী মা ও কৃষ্ণার নিবিড় সাহচর্য থেকে বঞ্চিত।এমন কী বাবা আনন্দমোহন পর্যন্ত তার প্রতি তেমনভাবে সচেতন নন । ভালবাসা এবং মমত্বের নিবিড় স্পর্শ থেকে বিচ্যুত ভ্রমরকে অসহ্য মানসিক চাপের শিকার হতে হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে অসুখের মারাত্মক ধকলে অনিবার্য ভাবে ভেঙে পড়েছে তার শরীরও ।

ভ্রমর কিন্তু জীবনের আনন্দ ও মাধুর্য থেকে নিজেকে নির্বাসিত করতে চায় না । সে চেষ্টা করেছে মনটিকে সর্বদা শান্ত ও প্রফুল্ল রাখতে । প্রভু যিশুর প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে নিজেকে অটুট রাখলেও ভালবাসার অভাব বোধই তাকে নিঃসীম বেদনার শীতার্ত ও শূন্য পরিবেশে নির্বাসিত করেছে ।

অবশেষে অমলের আগমন । এক ঝলক রোদ্দুরের মতই তার অমলিন বিচ্ছুরণ । অমল প্রাণের ছোঁয়ায় ভ্রমরের দুখী মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে । এতদিনে

ভালবাসায় নির্ঝরের সুর শোনা গেল । ভ্রমরের মনে হয়েছে অমলের মত আপন আর কেউ নাই । তার আঁধার মনের কোণে অমল হল ভালবাসার শিখায়িত প্রদীপ । প্রেমের অপরাজেয় ও পবিত্র বিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন ভ্রমর এই মুহূর্তে স্বচ্ছন্দে বলে উঠতে পারে :

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ বলে প্রেম, --গানের ছন্দের মত মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে ।
হৃদয় গন্ধের মত —হৃদয় ধূপের মত জ্বলে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন ।

ভ্রমর একান্তভাবেই বিশ্বাস করেছে, 'ভালবাসাই আরোগ্য', এবং এর হদিস সে এতদিন পায়নি । অমলের উষ্ণ আন্তরিকতা—গভীর মমত্ববোধ তার গ্লানি ও ক্লান্তিকে মুছে দিতে চেয়েছে । এক অনাস্বাদিত আনন্দঘন এবং রহস্যময় তৃপ্তিতে উদ্বেলিত ভ্রমরের সত্তা । কঠিন অসুখ ভ্রমরের জীবনী শক্তিকে পলে পলে ক্ষয় করে চলেছে । এর মধ্যেই ভ্রমর কিন্তু জীবনের এক পরম সত্যের অনুভবে নিমগ্ন।তাই বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনাতে অমল যখন ভেঙে পড়েছে —ভ্রমর তখনও অবিচলিত —অকম্পিত । তার বুকের ভিতরে পরিপূর্ণতার যে উপলব্ধি --তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে বিচ্ছেদ-বেদনা । ভালবাসা যে সব ব্যাধি দূর করে, সব কিছু ফিরিয়ে দেয়, -- এ বিশ্বাসে সে পূর্ণ । এই বিশ্বাসের পটভূমি হল :

মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় ।
(জীবনানন্দ, 'সুরঞ্জনা')

লিউকোমিয়ার মত ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত ভ্রমর হাসপাতাল থেকে আরোগ্য লাভ করে ফিরবে কী ফিরবে না --তা অমলের জানা নাই । কিন্তু নিশ্চিত রূপেই সে জেনেছে, সুখ বলে যদি কিছু থাকে -- তা ভালবাসা; বেঁচে থাকার যদি অন্য নাম হয় —নিশ্চিতভাবেই তা ভালবাসা । তাই তো তাদের, যাবতীয় অসুখ -বিষাদ আর বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও হৃদয়-কন্দরে একটি ফুল আকুল আশায় এবং পরম মমতায় লালন করে যেতে হবে : তারও নাম ভালবাসা ।

চলমান এই জগৎ । অসংখ্য জীবন ছুটে চলেছে তাদের পথে , অন্ধ আবেগে । প্রত্যেকেই হয়তো পৌঁছে যেতে চায় নিজস্ব অভীপ্সিত লক্ষ্যে । প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অদম্য তাগিদ । প্রায়শই আমরা বিস্মৃত হই সীমাবদ্ধতার ছোট গণ্ডিকে । গতিশীল এই মহাবিশ্বে আমরা যে নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র —এই মহাসত্যটি নিয়েও আবার অনেকের মনের মধ্যে জমে উঠতে থাকে অন্তহীন ভাবনার বুদ্বুদ । অপূর্ণতার সীমারেখার ভিতরেই পূর্ণতার ছোঁয়ায় নিজেকে ভরিয়ে তোলার জন্যে তখন অন্তরের মধ্যে জেগে উঠতে চায় এক তীব্র ব্যাকুলতা । গভীর বিষাদ । এই বিষাদে মন হয়ে ওঠে শূন্যতর । দুঃখ-যন্ত্রণায় দীর্ণ এই শান্তিহীন সংসারে মহৎ কর্মাদর্শই পূর্ণতার সুরটিকে যথার্থভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে , দূর করতে পারে অ-সুখের হাহাকার , তার পরিব্যাপ্ত বেদনাবোধ , — ইত্যাদি চিন্তা-ভাবনাই পরিব্যক্ত হয়েছে 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৩৭৪) উপন্যাসটির মধ্যে ।

উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমগ্র কাহিনী ও বক্তব্যের পূর্ব ও পূর্ণ আভাস । সন্দেহ নাই উপন্যাসের নামটি বিশেষভাবেই ব্যঞ্জনাবহ । পূর্ণতা হল সুখ , আর অ-পূর্ণতাই অ-সুখ । প্রত্যেকেই চায় সুখের স্পর্শ লাভ করতে , একই সঙ্গে বলা যাক —কোনও জনই চায় না সুখহীনতার কষ্টকে স্বীকার করে নিতে । আলোচ্য উপন্যাসটি পূর্ণ অপূর্ণের দ্বন্দ্ব , সুখ ও অসুখের তুলনামূলক বিশ্লেষণে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে । আমাদের জীবনের প্রকৃত দাবি কী ? —এই জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখেই জীবন-দর্শনের রূপকার ঔপন্যাসিক অগ্রসর হতে চেয়েছেন । এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আলোচকের মন্তব্য :

> "মানুষের জীবন অপূর্ণ , স্বভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার পথে । পরিণত মানুষ কিভাবে সে পথে যাবে ? তার জীবনে এত জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য । ফলে চোখের সামনে ভাল-বাসাকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়-ভাবে তাকিয়ে থাকে । পূর্ণের সন্ধান একালের মানুষকে কে দেবে ? বিমল কর তা দিতে চেয়েছেন 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে (১৯৬৭) ।"[২]

উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরেশ্বরের মধ্যে রয়েছে এক গভীর জীবনাভূতি। জীবনের যে রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, তা তাকে সাময়িক আবেগের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে — এবং একই সঙ্গে দিয়েছে মুক্তির সন্ধানী ঠিকানাও। কর্মময়তার মধ্যেই সে খুঁজে নিতে চায় পরমানন্দ। হৈমন্তী তাঁকে স্বার্থপর আখ্যা দিতে কুন্ঠিত হয়নি। অনেকের কাছেই সুরেশ্বর পলায়নবাদী নিছক আত্মতৃপ্ত মানুষ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু নির্মলার একান্ত সাহচর্য এবং অকাল বিয়োগ তাঁকে প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে নূতন এক ভাবনায় প্রাণিত হতে, পূর্ণতার শিখাকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যেই সুরেশ্বর গুরুডিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছে অন্ধ-আশ্রম। আর্ত মানুষের দু'চোখে সে আলো ভরে দিতে চায়।

হৈমন্তীও চেয়েছিল সুরেশ্বরের ভালবাসার উত্তাপে নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে; কিন্তু গুরুডিয়াতে আসার পর থেকেই সে বুঝতে পেরেছে কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে বড়। এতদিন ধরে যে সুরেশ্বরকে সে দেখে এসেছে, চিনেছে, এ সুরেশ মহারাজ তার থেকে ভিন্নতর। ওই পরিবর্তিত মানুষটি বড় কঠিন—বড় নিষ্প্রাণ। সুরেশ্বর একদিন হৈমন্তীকে ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে রক্ষা করেছিল, জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল তার। তাই কৃতজ্ঞতার জোয়ার হৈমন্তীর ভালবাসায় এনেছিল আবেগের প্রাবল্য; কিন্তু সুরেশ্বরের দৃষ্টি নিবদ্ধ মহাশূন্যে—যেখানে হয়তো অপেক্ষা করে আছে নির্মলা। তার কাছ থেকেই সুরেশ্বর বুঝতে শিখেছে, —

> এই মুহূর্তের সুখ পর মুহূর্তে বিষাদ হয়ে যেতে পারে। শৃঙ্খলাহীন, যুক্তিহীন, স্বৈরাচারী নির্মম কি যেন এক আছে। তার কাছে জীবনের সমস্ত কিছুই যেন আকস্মিক, অর্থহীন।

উপন্যাসের এক বলিষ্ঠ চরিত্র অবনী। ললিতার প্রখর শারীরিক আবেদনে অবনী অতি সহজেই প্রলুব্ধ হয়েছিল। ধরা দিয়েছিল ললিতাও। তাদের দাম্পত্য জীবনের বসন্তবাহার কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ফিকে হয়ে গেল। চরমতম তিক্ততার মধ্যেই পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে তাদের সম্পর্কের। অবনী তার দুর্দমনীয় পৌরুষ

'দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষা' নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কি-তু নিদারুণভাবেই হোঁচট খেয়েছে সে। রক্ত-ঝরণ হয়েছে তার বুকেও। অমৃত চেয়েছিল অবনী, পেয়েছে গরল। অবনীর মধ্যে মারাত্মক ভাবেই পরিস্ফুট অপূর্ণতার জ্বালা। কুমকুমের জন্যে চি-তা তার অসহায় অক্ষমতাকে আরও প্রকট করেছে। রুগ্ন, মলিন কুমকুম যেন অবনী আর নলিতার ব্যর্থ-অসুস্থ দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। অবনী কি-তু এই হতাশার ভিতরেও অগ্রসর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। জীবনের তো ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট কোনও আকার নাই। তা সততই প্রবহমান। তাই হৈম-তীর স্নিগ্ধতা, জীবনানুরাগ তাকে বিমুগ্ধ করে, উৎসাহী করে তোলে। এই মুগ্ধতার মোহকে অবনী নিজের বুকের মধ্যে জিইয়ে রাখতে চায়। কুমকুমকে সে দিতে চায় মুক্ত জীবনের স্বাদ। অপগত অতীতের যন্ত্রণায় অবনী দীর্ণ, অথচ অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে বুক বাঁধতেও আপত্তি নাই তার।

উপন্যাসভুক্ত নির্মলার চারিত্রিক আবেদন অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে নির্মলাই সমগ্র কাহিনীর মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কী পাওয়া যেত, অথচ পাওয়া গেল না,—এই নিয়েই যেন নির্মলার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। নির্মলার ক্ষীণ দৃষ্টির ম্লান আলোই সুরেশ্বরের সমগ্র জীবন-প্রবাহের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের ভিতরেই সুখহীনতার ছায়া পরিব্যাপ্ত। শারীরিক রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু উপন্যাসের মধ্যে যেমন স্পষ্ট, তেমনি পরিস্ফুট মানসিক অতৃপ্তি, বেদনা, অপূর্ণতার দুঃসহ যন্ত্রণা, কাহিনীর প্রথমাংশেই হাসপাতাল প্রত্যাগত অবনীর বিষণ্ন-ভারাক্রান্ত মানসিকতার ছবি স্পষ্ট :

> হীরালালের কথা তার মনে স্থায়ী কোনো
> ছায়ার মতন পড়ে ছিল। বেচারী হীরালাল।
> এখনও তাকে হাসপাতালের বিছানায় দেখা যাবে,
> দু'পাশে পরদা ফেলে দেওয়া হয়েছে, অক্সিজেন
> চলছে, হয়ত সন্ধ্যায় বা রাত্রে কিংবা কাল সকালে
> শেষ বারের মতন একটু অক্সিজেন নিয়ে সে চলে যাবে,
> তার শয্যা শূন্য হবে।

অথচ হীরালাল ছিল সব দিক থেকেই চমৎকার এক যুবক । অনেকগুলি সৎ গুণের অধিকারী হীরালাল ভয়ঙ্কর জখম হয়েছিল আকস্মিক ভাবে গাড়ি উল্টে যাওয়ায় ।

> শরীরের বাইরে তেমন একটা ভাঙাচোরা
> রক্তারক্তির চিহ্ন ছিল না । ছোকরা অজ্ঞান
> হয়ে গিয়েছিল । হাসপাতালে নিয়ে যাবার
> পর জানা গেল, মাথায় জোর চোট লেগেছে,
> রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভেতরে ।

অবনীর মনের মধ্যে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল । তার মনে হচ্ছিল জীবন মানেই চরম অনিশ্চয়তা । অকারণেই যেমন আসা সত্য, তেমনি অকারণেই যেন বিদায় নেওয়া ! মাখারিয়ার পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে যেতে-যেতে অবনী ভীত হচ্ছিল । হীরালালের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক মৃত্যুই বোধহয় তার মনে ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল ।

> অবনী ভাবল, শ্মশান দর্শনে যেমন সাময়িক
> বৈরাগ্য, শ্রাবণের মেঘ দর্শনে মন যেমন
> ক্ষনিক উদাস হয় —এও সেই রকম । স্বাভাবিক,
> অথচ অর্থহীন । হীরালালের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর
> জন্যে বেদনা অনুভব করলেও, অবনী এখন আর
> সেই উৎপীড়ন বোধ করছিল না । সংসারের এ
> রকম হয়; শত সহস্র হচ্ছে । কেন হচ্ছে,
> এ প্রশ্ন অবান্তর ? জীবনের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর
> থাকে না । সান্ত্বনার জন্যে স্বীকার করে নাও,
> হীরালালের মৃত্যু দুর্দৈব, দুর্ভাগ্য ।

সুরেশ্বর কিন্তু দুর্ঘটনা নিয়ে অবনীর মত বিচলিত নয় । অবনীকে সে মৃদুস্বরে জানায় :

> "আপনাকে একটা কথা বলি, সঠিক-মানুষেই
> বলেছেন । বলেছেন : যাকে আমরা হারাই,
> সে আমাদেরই সুন্দরমহলে কোথাও শুয়ে
> ঘুমিয়ে আছে — এ রকম ভেবে নেওয়াই ভাল।

তাকে ডাকাডাকি করে জাগাবার চেষ্টা
অনর্থক । কান্নাকাটি আমরা করি , কিন্তু
তাতে সে জাগে না । চেঁচামেচি করলে
কিছু পাওয়া যায় না , শুধু প্রমাণ হয় ,
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা আমরা কিছু
জানি না জেনেও বুঝি না ।"

অবনী সুরেশ্বরের এই নির্বিকারত্ব , অবিচলিত শান্ত ভঙ্গি , দার্শনিকের মত কথাবার্তায় বিরক্ত হয় । মৃত্যু তাকে ব্যথিত করে । সুরেশ্বর কথিত 'প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম' সে স্বাভাবিক মনে মানতে পারে না । অবনী সুরেশ্বরকে ব্যঙ্গ করেছে । সুরেশ্বরের বক্তব্যে কিন্তু আগেকার সেই অবিচলিত ভঙ্গি , —

"আকাশ ও পৃথিবী মানুষের শবাধার ।
সূর্য , চন্দ্র তার শব শয্যার সাজ ,
নক্ষত্রগুলি আমার গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া
ফুল । সমস্ত জীব আমার শবযাত্রার
সঙ্গী । মৃত্যুর কাছে সকলেই আমাকে
বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ।"

সুরেশ্বরের মত মানুষদের প্রতি অবনী মনে মনে কোনওদিনই তেমন প্রসন্ন ছিল না । অবনী মনে করে ওরা ধর্ম-সেবা-মুক্তি ইত্যাদির দোহাই পেড়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছে । অবনীর মনে হয় এরা শুধুমাত্র পলায়নবাদেই বিশ্বাসী নয়, সংসারের যাবতীয় কামনা-বাসনা-মোহকে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করে যেতেও এদের দ্বিধা নাই বিন্দুমাত্র । লোকালয় বিচ্ছিন্ন নির্জন জঙ্গলের মধ্যে সুরেশ্বরের অন্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাই সে খোলা মনে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না । তার বারবার মনে হয় সুরেশ্বর নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে , সে পলায়নবাদী ।

সুরেশ্বর আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিল অতি সাধারণভাবে । এখনও বিরাট কিছু হয়ে ওঠেনি , তবে মোটামুটি মাপের আদল একটা পেয়েছে ।

তবু , এখানে –বনে জঙ্গলে দেহাতে- যেখানে
কোনো কিছুই ঘটে না , প্রাকৃতিক নিয়মে শুধু

গাছপালা বাড়ে আর জৈবিক নিয়মে মানুষের
জন্মমৃত্যু ঘটে — সেখানে সাধারণ যা ঘটল,
যতটুকু ঘটল তাতেই অনেকে বিস্মিত হয়,
হয়ত মুগ্ধও হয়। সুরেশ্বরের 'অন্ধ আশ্রম'
অনেকটা সেই রকম বিস্ময়কর ঘটনা।

সুরেশ্বরের পারিবারিক জীবনের ছবি বড় মলিন। উত্তরাধিকারত্বের গর্ব বলতে যা বোঝায়, তা থেকে সুরেশ্বর ছিল বঞ্চিত। তার ছেলেবেলার কথা হৈমন্তী যতটা শুনেছে, তাতে সুরেশ্বরের প্রতি সে সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছে।

ওর মা ছিলেন অসুস্থ, মাথা পাগল;
বাবা ছিলেন যেমন রাশভারী তেমনি দুর্জন।
অর্থ ছিল, অত্যাচারও ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে
বড় একটা সম্পর্ক রাখেন নি। সুরেশ্বরের
মা বেঁচে থাকার সময়েই তিনি অন্য এক
লোককে স্ত্রী হিসাবে রেখেছিলেন। এই
উপপত্নীটি থাকতেন কলকাতায়। কাজেকর্মে
সুরেশ্বরের বাবাকে প্রায়ই কলকাতায় এসে
থাকতে হত। বাসা ছিল, ব্যবস্থাও ছিল।
মহিলার একটি পুত্র সন্তান হয়। সুরেশ্বরের
বাবার মৃত্যুর পর সম্পত্তির দাবী করে মামলার
ভয় দেখিয়েছিল ওরা। সুরেশ্বর মামলা
চালায়নি, দাবী মিটিয়েছিল।

সুরেশ্বর হৈমন্তীকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, সংসার যেমন সুখের নয়, তেমনি জগৎও নিখুঁত নয়। অসুখের সংসারেই সকলের জন্ম।

হৈমন্তী কিছু বুঝল না; বলল, "সংসারে সবাই সুখ চায়।"
"তা তো চাইবেই।"
"তবে ?"
"সুখের কোনো চেহারা নেই। যে যেমন করে
তাকে গড়ে নেয়।"

"তাই বা পায় কোথায় ?"

"না পেলে উপায় নেই ।"

হৈমন্তী মনে করে সুরেশ্বরের কাছে এখন তার প্রয়োজন নিতান্ত এক চোখের ডাক্তার হিসাবে ; সুরেশ্বর কেমন যেন বদলে গেল । অথচ চেতনায়-অর্ধচেতনায় সম্পূর্ণভাবেই তাকে ধারণ করেছিল হৈমন্তী । এই সুরেশ্বরই তাকে একদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল ; তার দু'চোখে ভরে দিয়েছিল নতুন জীবনের স্বপ্ন । হৈমন্তীর মনে পড়ে যায় তার অসুখের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠবার সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা, --

কোথাও কোনো মেঘ না, আভাস নয়, জ্বর
গায়ে ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে হৈমন্তী হঠাৎ
একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বসে কাশতে কাশতে
রক্ত-বমির মত রক্ত ফেলল । তারপর অল্প অল্প ।
ডাক্তার মুখ ভার করল ।... শেষে বোঝা গেল
ব্যাধিটা রাজব্যাধি ।

সেই দুঃসময়ে যা কিছু করবার সবটুকুই করেছিল সুরেশ্বর ।

অসুস্থতার দু'আড়াই বছর হৈমন্তী যে
সুরেশ্বরকে দেখেছে সে-সুরেশ্বর হৈমন্তীর
নিকটাত্মীয়ের অধিক । সুরেশ্বরের জীবন
যেন তার মরা-বাঁচার ওপর নির্ভর করেছে।
হেম বেঁচে থেকে সুরেশ্বরকে বাঁচিয়ে রেখেছে,
সুরেশও হেমের আয়ু-দীপ হয়ে থেকেছে ।

কিছুদিন বাড়িতে চিকিৎসা, তারপরে বাইরের হাসপাতাল, অবশেষে ঘাটশিলায় থাকার পর হৈমন্তী মুক্তি পেয়েছিল । এই ব্যাধির কাছ থেকে হৈমন্তী দুটি জিনিস পেয়েছিল । সুরেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেম যেমন তাকে আপ্লুত করেছে, তেমনি সে প্রয়াসী হয়েছে কর্মক্ষমতা ও সক্রিয় আচরণের মাধ্যমে হীনতাবোধকে অতিক্রম করে যেতে । সুরেশ্বরের আগ্রহাতিশয্যেই সে ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হয়েছিল । পাস করার পর আবার সে চোখের ডাক্তারি পড়ল সুরেশ্বরের অনুরোধেই ।

> হৈমন্তী ভেবেছিল, সে সুরেশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেছে, সুরেশ্বরও তার ইচ্ছা পূর্ণ করবে। কেন যেন, আজকাল তার দ্বিধা এসেছিল, মনে হত সেই সুরেশ্বর— যে তাকে মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছে, বিস্বাদ, বিবর্ণ, মুখে মাছি বসা এক জগৎ থেকে — সে যেন আড়ালে কোথাও সরে যাচ্ছে।

বুকের মধ্যে অনেক আশা আর ভালবাসা জমিয়ে হৈমন্তী এসেছিল গুরুডিয়াতে। সুরেশ্বর কিন্তু এখন অন্য এক মানুষ। হৈমন্তীর বুকের মধ্যে এখন নিরন্তর হতাশা, চোখেতে আর স্বপ্ন নয়; আছে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা।

উপন্যাসের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র অবনী। অবনীর মনের মধ্যেও শান্তির বড় অভাব। জীবনের অনেক পাওনা এবং হিসাব থেকে সে বঞ্চিত। সাময়িক সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির রেশ তার যন্ত্রণাকে আরও গভীর করেছে। সুরেশ্বরের মত অবনীর পারিবারিক বৃত্তান্তও আবিলতায় আচ্ছন্ন। তার জন্ম-পরিচয়ও গৌরবের ছিল না। অবনী জানতে পেরেছিল — বাবার সঙ্গে নয়— তার রক্তের বন্ধন মায়ের সঙ্গেই। তার বাবা ছিল চূড়ান্ত মাত্রায় অপদার্থ। নেশা ও নোংরামির জন্যে তাকে পয়সা জোগান দিত অবনীর মা। মেরুদন্ডহীন বাবার ওপরে মায়ের ছিল নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। আর অবনীর নিজস্ব দাম্পত্য জীবন? সে দিক থেকেও অবনী ছিল প্রকৃতই হতভাগ্য। স্ত্রী ললিতার সঙ্গে তার ছিল মাত্র কিছুদিনের সম্পর্ক।তারপর শুধুই তিক্ততা, গৃহদাহের জ্বালা।

> ললিতা বলত: অবনী তাকে মাংসের দরে কিনেছে। অবনী জবাব দিত: ফুলের বাজারে বিকোবার মতন ললিতার কিছুই নেই। ওরা পরস্পরকে বিরক্তি- বিতৃষ্ণার মধ্যে নতুন করে চিনতে লাগল। অবনী বুঝতে পারল, ললিতার স্বভাব অত্যন্ত নোংরা, সে হীন, স্বার্থপর, হিসেবী, দায়িত্বহীন, বিলাসী। ললিতাও বুঝতে পারল, অবনী হৃদয়হীন, অহংকারী, রুক্ষ, কামুক, উদ্ধত। উভয়ে উভয়ের সহস্র রকম ত্রুটি আবিষ্কার

করতে পেরে যেন সুখী হচ্ছিল ; অথবা নিজেদের
সান্ত্বনা দিতে পারছিল ।

অবশেষে সম্পূর্ণভাবেই ছিন্ন হল তাদের দাম্পত্য-বন্ধন । অবনী ছেড়ে দিল ললিতাকে । সে চেয়েছিল একমাত্র সন্তান কুমকুমকে নিজের কাছে রাখতে, ললিতা কিন্তু মেয়েকে নিজের কাছে রেখে ছিল স্বার্থ-সিদ্ধির মতলবে । কুমকুমকে ললিতা ভালমত প্রতিপালন করবে, এটাও অবনীর টাকা পাঠানোর অন্যতম সর্ত ছিল । অবনী চেয়েছিল কুমকুমের শৈশব মুক্ত বাতাসের আশ্বাস পাক । অবনীর নিজস্ব শৈশব সুখের ছিল না । অবনী বুঝতে পারছিল, আত্মসর্বস্ব ললিতার কাছে থাকলে ভাল কিছু হবে না কুমকুমের । কিন্তু অনন্যোপায় হয়েই তাকে সব কিছু মেনে নিতে হয়েছে । বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ললিতার জন্যে নয়, কুমকুমের জন্যেই অবনী মুষড়ে পড়েছিল । হঠাৎই তার কাছে পৌঁছাল কুমকুমের অপটু হাতের লেখা, কান্না-ভেজা এক চিঠি । কোনওরকমে বোধহয় অবনীর ঠিকানা জানতে পেরে লিখেছে, —

"বাবা আমার টাইফয়েড হয়েছিল । একশো
পাঁচ জ্বর হয়েছিল ।...বাবা, আমার খুব
খিদে পায়, মা দুটো কমলালেবু দেয় ।খুব
টক । ... পুজোর জামাটা বিচ্ছিরি হয়েছে।
আমার ভাল ফ্রক নেই, জুতো নেই ।....
বাবা, মামি আমায় বলেছে, আমি মরে যাব।
....আমায় ভাল ফ্রক, জুতো কিনে পাঠিয়ে দিও ।
ক্যাডবেরি দিও । বাবা, আমি দুটো ক্লিপ পেয়েছি,
জগুদা দিয়েছে । তুমি আমায় দেখতে আসবে ।..."

অবনীর সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই চিঠিটি-ই যথেষ্ট । ললিতা অন্য কারও শয্যাসঙ্গিনী হোক, মদ খাক, তাতে তার কিছুই যায় আসে না ; কিন্তু তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছে তার আত্মজা, —এটা অবনীর কাছে অসহ্য । কুমকুমকে বাঁচাতে হবে যে কোনও প্রকারেই, ...চিন্তা করতে করতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে অবনীর ।

সুরেশ্বরের জীবনে নির্মলার উপস্থিতি কাহিনীর গতিকে ভিন্ন মুখে পরিবর্তিত করেছে। নির্মলার সঙ্গে পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই সুরেশ্বর হৈমন্তীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল অনেকখানি। আসলে নির্মলা সুরেশ্বরের জীবনে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে।

> হেম যে মাত্র সে-দিনও তার কাম্য বস্তু ছিল, সুখ ছিল — এ কথা সে অস্বীকার করতে পারত না। হেমের প্রতি তার মমতা ও স্নেহ কোন অংশে কমেনি। কিন্তু সুরেশ্বর হেমের মধ্যে কোনো গভীর আনন্দ খুঁজে পেত না। কিংবা বলা ভাল, নির্মলার মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যেত, হেমের মধ্যে তা ছিল না। কেন ছিল না, কেন সুরেশ্বর হেমের মধ্যে তার আনন্দ পেত না — সে জানে না।

নির্মলার রূপ ছিল না, কিন্তু ছিল এক অসাধারণ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের প্রকাশ তীব্র ছিল না, তার মধ্যে ছিল এক নিভৃত উৎসারণ — অনির্ণেয় ব্যাকুলতা। এক দুর্যোগের মুহূর্তে ক্ষীণ দৃষ্টি নির্মলাকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল সুরেশ্বর; সেই থেকে নির্মলা ও তার ভাই-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

> ঠিক কি কারণে নির্মলার চক্ষুরোগ দেখা দিয়েছিল— এ কথা কেউ বলতে পারে নি। নানা মুনির নানা মত ছিল। শিশুকাল থেকেই নির্মলার চোখে কষ্ট ছিল, বয়স বাড়ার পরে সেটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম সাধারণ চিকিৎসা ও চশমা পরিয়ে ব্যাধিটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে আরও নানারকম চিকিৎসা হয়েছে, প্রমথ সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই ব্যাধির কোনো প্রতিকার হয়নি। এখন প্রমথ নিরুপায়, শুধু অমঙ্গলের মতন অপেক্ষা করে আছে।

নির্মলার অজানা ছিল না সে একদিন অন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তা নিয়ে সে উদ্বিগ্নও ছিল না। সুরেশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল :

'তোমার ভয় করে না ? চোখ হারালে তোমার
কতখানি যাবে তা ভেবে দুশ্চিন্তা হয় না ?'
নির্মলা মাথা নাড়ল, 'এক সময় হত। এখন
বোধহয় সহ্য হয়ে গেছে।' বলে সামান্য থেমে
হাসির মুখ করে বলল, 'সংসারে কতশত অন্ধ
আছে, বলো ! তারাও তো রয়েছে।'

হেমের দুঃখ সুরেশ্বরকে বৃহৎ কোনও বেদনার সঙ্গে পরিচিত করায়নি। একসময় ভয়ঙ্কর ব্যাধি তার জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল, আরোগ্যলাভের পরে ঝকমকে হয়ে উঠেছিল সে আবার। কিন্তু নির্মলার বেদনা অন্যরকম।

নির্মলার মধ্যে যে-বেদনা তা যেন তার ব্যক্তিগত
দুর্ভাগ্য নয়। সুরেশ্বর বুঝতে পারত না — কিন্তু
অনুভব করত, নির্মলা যেন মানুষের এমন একটি
অবস্থাকে ইঙ্গিত করছে যার ওপর তার কোনো
হাত নেই। আয়ত্তাতীত এই অদৃষ্ট, অথবা সেই
পরিণতি যাকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই—
নির্মলা যেন সেই পরিণতির অসহায়তা প্রকাশ করছে।

এই নির্মলা একদিন চিরতরে হারিয়ে গেল এক দোল-পূর্ণিমার রাতে। আবীরের ছোট টিপটির সৌন্দর্য আর পবিত্রতা নিয়ে নির্মলা যখন সুরেশ্বরের চোখে ভাসছিল, ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে ভেসে এল এক 'বীভৎস আতঙ্কের চিৎকার।' চা করে আনতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল নির্মলা। কী করে যেন আগুনের শিখা তার ক্ষীণ তনুর ওপরে লেলিহান হয়ে উঠেছিল।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় নির্মলা অজ্ঞান ছিল।
পরের দিন দুয়ের মাথায় তার জ্ঞান হয়েছিল; এই
জ্ঞান কুয়াসাচ্ছন্নচেতনার। অবশিষ্ট কয়েকটি দিন
নির্মলার ওই ভাবেই কেটেছে। কথা বলার আপ্রাণ
চেষ্টা ছিল, পারত না; অস্পষ্ট করে কিছু বলত,

কিছু বলতে বলতে থেমে যেত । কয়েকটি দাহের জ্বালা যেন তার দুর্বল শীর্ণ দেহটিকে শববাহকের মতন বহন করে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর কাছে নিয়ে গেছে । কিন্তু এই সরল সমাপ্তির আগেই নির্মলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ।

কি করে হয়েছিল সেটা রহস্য । হয়ত সেদিন রান্নাঘরে চা-করার সময় সে হঠাৎ তার চোখের সামনে সব আলো নিবে যেতে দেখে বিহ্বল হয়ে চলে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে শাড়ির আঁচলে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিল, হয়ত সে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশত এবং অসতর্কতাহেতু শাড়িতে আগুন লাগিয়ে ফেলে-ছিল আগেই —তারপর সহসা আতঙ্কে তার স্নায়ু আহত হয়ে পড়েছিল, সেই আঘাত তার অতি দুর্বল দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ে । অন্য কিছুও হতে পারে ....। কে জানে । নির্মলা মনে করে কিছু বলতে পারে নি । বলা যায় না হয়ত ।

তার পর সুরেশ্বর ব্যাকুল হয়ে উঠল । জীবন তার কাছে অর্থ শূন্য মনে হত । এমন রিক্ততার মুখোমুখি আর কোনদিন সে হয়নি । সুরেশ্বর কলকাতা ছাড়ল । গুরুডিয়াতে অন্ধ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করল । অন্ধ-জনে সে আলোর ঠিকানা জানাতে চায় ।

এদিকে গুরুডিয়াতে হঠাৎ-ই ত্রাসের সঞ্চার ঘটেছে । মনোহর মেলাতে গিয়েছিল । ফিরল অচেতন হয়ে, গা আগুনের মত গরম । ক'দিনের মধ্যেই মনোহর মারা গেল । শুধু তাই নয়, —

গগন মারা যাবার পরই অন্ধ আশ্রমের বুড়ো তিলুয়া অসুখে পড়ল । অনেকটা একই ধরনের অসুখ বলে মনে হচ্ছিল । মনোহর জোয়ান গোছের বলে এই অদ্ভুত ব্যাধির সঙ্গে ক'দিন

লড়েছিল , তিনুয়া পারল না , তার বয়েস হয়েছিল,
প্রথম ধাক্কাতেই শরীরের কলকব্জা বিগড়ে জটিলতা
সৃষ্টি হল , মারা গেল নিউমোনিয়া হয়ে ।

হৈম-তী চোখের ডাক্তার 'রেটিনাইটিস ', 'কেরাটাইটিস ', 'গ্লুকোমা '-এ সব সহজেই সে চিকিৎসা করতে পারে , কি-তু অনেক ভাবনা-চি-তা সত্ত্বেও এই ভয়ঙ্কর রোগের সঠিক 'ডায়াগনসিস ' করতে সে ব্যর্থ হয়েছে । সুরেশ্বরের গভীর দুশ্চি-তা---কী করে আশ্রমের মানুষগুলোকে নিরাপদে রাখা যায় । সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে সরকারি হাসপাতালেও এ ধরনের রোগী জন চারেক এসেছিল ।

দু'টো মারা গেছে , একটা বেঁচেছে ; একটা
ভুগছে এখনও । রোগটা অদ্ভুত , কি রোগ কেউ
বলতে পারছে না । কেউ বলছে 'টাইফাস ' , কেউ
বলছে অন্য কিছু ।

এরই মধ্যে গির্জা কেমন করে যেন এই ভয়ঙ্কর রোগের কবলে পড়েও বেঁচে গেল । রোগটা যে মহামারীর মতই এ তল্লাটে ছড়িয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না কারও ।

হৈম-তী কি-তু গুরুডিয়াতে আর থাকতে চায় না । কলকাতাতেই তার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা । সুরেশ্বর অসুখ-বিসুখের প্রসঙ্গ টেনে ডাক্তার হিসাবে হৈম-তীর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে । সুরেশ্বরের এই সেবা-ধর্ম সম্পর্কিত কথা-বার্তা হৈম-তীর সহ্য হয় না । সে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় সুরেশ্বরের ওই সব আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাতে সে আর রাজি নয় । 'ছকের ঘুঁটি ' হিসেবে ব্যবহারের জন্যেও সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ তুলে ধরেছে হৈম-তী । প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য রবী-দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ ' উপন্যাসেও 'দশ পঁচিশের ঘুঁটি ' হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে দামিনী শচীশকে অভিযুক্ত করেছিল ।[৩] হৈম-তীর এই অভিযোগ-অনুযোগে সুরেশ্বর বিস্মিত-বেদনাহত । সে জানায় , —

''হেম আমি তোমায় ছকের ঘুঁটি করব ,
এ-কথা আমি ভাবিনি কখনও । আমার
মনে হত , তুমি অল্প বয়সে মানুষের

দুঃখের দিক দেখেছ, নিজেও সেই
অসহায়তার স্পর্শ পেয়েছ, হয়ত তুমি
সাধারণ সংসারের বেড়ার বাইরে আসতে
আপত্তি করবে না।"

সুরেশ্বর যতই ভাবুক, যতই বলুক না কেন,—হৈমন্তী কিছুই মানতে চায় না। জবাব দিতে গিয়ে অনেক কথাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। দয়া-ধর্ম-হাসপাতাল এ সব নিয়ে তো অনেকেই ব্যস্ত থাকে, কি-তু তার জন্যে নিজের ঘর-ভালবাসা সমস্ত কিছু অনায়াসে বিসর্জন দিতে হবে? সুরেশ্বরের প্রত্যাখান হৈমন্তীর বুককে বেদনাহত করে তোলে।

হৈমন্তীর বুকের মধ্যে যত ক্ষোভই জমা হোক না কেন, সুরেশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতাকে কি-তু সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। যদি পারত, তাহলে সুরেশ্বরের জ্বরের খবর পেয়ে ওর রকম বিহ্বল হয়ে পড়ত কি?

"হেমদি, দাদার খুব জ্বর," ছুটতে ছুটতে এসে
মালিনী বলল।
"জ্বর!" হৈমন্তীর বুকের কোথায় যেন ভয়ংকর
একটা ভয়ের ঘা লেগে হৃৎপি-ড ধক করে উঠল,
উঠে দোলকের মতন ভয়ে দুলতে লাগল। বিমূঢ়
দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হৈমন্তী ভীত
গলায় বলল,
"জ্বর! কখন জ্বর এল?"
"রাত্তির থেকে," মালিনী বলল।
হৈমন্তীর হাত-পা যেন কাঁপছিল সামান্য।
মালিনীর বিহ্বলতা তাকে ভীত করেছিল।
কিছু খেয়াল না করেই বলল, "কত জ্বর?"

হৈমন্তী সুরেশ্বরকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে। অসুস্থতা অতটা গুরুতর নয় জেনে স্বস্তি ফিরে এসেছে তার। এই সময় কথা-বার্তার ফাঁকে সুরেশ্বর হৈমন্তীকে জানিয়ে

দিয়েছে নিজের জীবনে —আশ্রমের প্রয়োজনে, —হৈম-তীকে আর সে জড়িয়ে রাখতে চায় না।

"কাল তুমি ঠিকই বলেছ, হেম। এখানে
থাকলে তোমার অসুখ-বিসুখ হতে পারে;
হলে যে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়বে।
যদি কিছু হয়। এ-অসুখের কিছুই যখন
ঠিক নেই—তখন তোমার জীবনের দায়িত্ব
আমার নেওয়া উচিত নয়। ...আমি
যা দিতে পারব না, তা আর নেব না।"

গুরুডিয়ার ক্ষধাশ্রমের গতি এখন অন্যরকম। আরোগ্যের যে স্বাভাবিক পরিবেশটি এতদিন ধরে গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গেছে। চোখের হাসপাতালও এখন ব-ধ। ইতিমধ্যে হরিকিষেণের ভাইকে অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। ডাক্তার, মেল নার্স, সিস্টার, কম্পাউন্ডার, জমাদার প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্তর আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে গেছে। সদর থেকে হাকিম সিভিল সার্জেনকে নিয়ে তদারকি করে গেছেন।

আশ্রমের মধ্যে কেমন একটা থমথমে ভাব জমে
আসছিল। মনোহর আর বুড়ো তিলুয়া মারা
যাবার পর এই রকম একটা ভাব হয়েছিল,
তারপর সেটা কাটছিল, আস্তে আস্তে এখন
আবার সেই থমথমে ভাবটা এল। কারও কারও
চোখে আতঙ্ক, কেউ বা কেমন স-ত্রস্ত।
এক সময় এই জায়গাটা আশ্রম বলেই মনে হত,
নিরিবিলি নিরুদ্বেগ শান্ত সহজ একটা জীবন
ছিল, এখন মনে হয় সত্যিই কোনো হাসপাতাল:
ভীতি, স-ত্রাস, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। সব্জি-
বাগানের গন্ধের বদলে ফিনাইল আর ব্লিচিং

পাউডারের উগ্র গন্ধ ; বাতাসে থেকে থেকে
সাদা গুঁড়ো উড়ছিল পাউডারের ।

অবনী ভেবেছিল সুরেশ্বর শুধুমাত্র তত্ত্ব আর আদর্শের ভিত্তি-ভূমির উপরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে । সুরেশ্বরের তেমন কোনও দুঃখ নাই , —

আপনি দুঃখের কিছুই জানেন না ।
বই পড়ে , হাত জোড় করে দুঃখ
চেনা যায় না । ....আপনি যদি
এখন তত্ত্বের বুলি আওড়ান , সংসার
দুঃখময় মোহময়-টয় বলেন তবে সেটা
অন্য কথা । ওটা ধার্মিক দুঃখ ।
আমি তো আপনার কোথাও কোনো
দুঃখ-টুঃখ আছে বলে দেখি না ।"

পরে অবশ্য অবনী নিজস্ব ভুল বুঝতে পেরেছে । অবনীর অ-সুখ আর দুঃখের চাইতে সুরেশ্বরের দুঃখ যন্ত্রণা কোনও অংশেই কম নয় । সুরেশ্বর কিন্তু নিয়তির বিধান চিন্তা করে নির্বিকার , অবিচলিত । কিছুক্ষণ আগেই সে অবনীকে বলেছে,—

"সংসার কি সুখের ? "
"আমি তো জানি অ-সুখের ।"
"আমিও তাই জানি । দুঃখের সংসার ।"
"জেনেও আপনি সুখী । "
"না , আমি সুখী নই —"সুরেশ্বর আস্তে আস্তে বলল ।
"আপনি কি দুঃখী ?"
"মানুষ মাত্রেই দুঃখী ।"

সুরেশ্বরের জীবন প্রকৃতই বড় বিচিত্র । হেমের অসুখে সে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিল । হেম যখন আরোগ্য লাভ করল— তখন সুরেশ্বরের জীবনেও এক নতুন স্বাদ এসেছিল । হেমের জীবনের সঙ্গে তার জীবন এক হয়ে গিয়েছিল , তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক , মনের মধ্যে অপূর্ণতার রেশ ; —এমন সময়েই নির্মলার সঙ্গে তার দেখা ।

নির্মলা তার পরিণত যুবক বয়সের মনটিকে
যেন কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ।
বিশ্ব সংসারে এত দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা,
অসুস্থতা, ব্যর্থতা আছে যার বুঝি পরিসীমা
নেই ; তবু মানুষ কি আশ্বাসে বাঁচবে ? কেন
বাঁচবে ? নিরর্থক জীবন ধারণে কোন সান্ত্বনা
আছে ? নির্মলা বলত : আছে —কিছু আছে ;
দেখ না কি পাও ।

গুরুডিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে হৈমন্তী অবনীকে তার নিভৃত বেদনার সবটুকুই প্রকাশ করেছে । অবনীও নিজেকে উন্মুক্ত করতে গিয়ে কিছুই গোপন রাখেনি । তার দুঃসহ ক্ষত, ললিতার সঙ্গে মৃত সম্পর্ক, কুমকুমের জন্যে ভাবনা, —সব কিছু হৈমন্তীকে ব্যক্ত করে এক দুঃসহ পাষাণ-ভার থেকে সে অব্যাহতি চেয়েছে । হৈমন্তীর কাছে অবনীর যেমন প্রয়োজন ছিল নিজেকে উন্মুক্ত করার, তেমনিভাবে হৈমন্তীরও দরকার ছিল অবনীর কাছে নিজস্ব বেদনাকে সম্পূর্ণত প্রকাশ করার । হৈমন্তী গুরুডিয়া থেকে ফিরে গেল কলকাতায় । যে প্রত্যাশা নিয়ে সে এসেছিল, পূর্ণ হয়নি তার । ভেঙে পড়েও সে কিন্তু ফুরিয়ে যেতে চায় না । অবনীর জন্যে রইল তার সুমধুর আমন্ত্রণ ।

হৈমন্তী চলে যাওয়ার পরে সুরেশ্বর অবনীকে জানিয়েছে হেমকে সে এখানে কিছুই দিতে পারল না, যার দুঃখটা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে । সুরেশ্বর আরও জানিয়েছে, —

অসুখের সময় হেমের বয়স ছিল অল্প ।
সে ওই বয়সে সংসারের এমন জায়গায়
গিয়ে পড়েছিল যেখানে শোক, দুঃখ, কষ্ট,
অসহায়তা । আমার মনে হত, হেম দুঃখকে
নিজের জীবন দিয়ে দিনে দিনে চিনে নিচ্ছে ।
ওর তখন কত মমতা দেখেছি, কত ভালবাসা
দেখেছি । ভেবেছিলাম, ওর মধ্যে দুঃখের বোধ

হয়েছে । ওর তা হয়নি । আমারও নয় । তারপর ও সুস্থ হল, ঘরে এসে বাইরের দুঃখ ভুলে গেল । ....আমিও হয়ত ভুলে যেতাম, কিন্তু আর একজন এল, যে আমায় ভুলতে দিল না, সে আমায় কোথায় যে হাত ধরে নিয়ে গেল ...থাকল না ... আমায় রেখে চলে গেল ..."সুরেশ্বরের গলা ভরে এসেছিল, যেন কণ্ঠ নয় —তার হৃদয় কিছু বলছে ।

অবনী ভেবেছিল সুরেশ্বর কিছু প্রাপ্তির আশায় গুরুডিয়াতে এসেছিল । কিন্তু সুরেশ্বরের কথাতে তার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে । ঈশ্বর সম্পর্কিত সুরেশ্বরের ভাবনা অবনীকে চমৎকৃত করেছে, —

সুরেশ্বর মৃদুস্বরে বলল, "মানুষ তার সমস্ত অভাব, ব্যর্থতা, অপূর্ণতা, অক্ষমতার কথা নিজে যত জানে আকাশের ভগবান তত জানে না । ঈশ্বর আমার কাছে মানুষের কাম্য ও প্রার্থিত সমস্ত গুণের সমষ্টি । আমার ঈশ্বর নির্গুণ নয় ।" সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামল, পরে বলল, "মানুষ তার দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, শৌর্য, সৌন্দর্য —সমস্ত কিছুর চরম কল্পনা ঈশ্বরের উপর আরোপ করেছে; তাই ঈশ্বরের চেয়ে মমতাময় প্রেমময় আর কিছুকে বলি না । অপূর্ণ মানুষের ধারণায় ঈশ্বর তাই পূর্ণ । ....এই দেবত্ব মানুষ শুধু ঈশ্বরকেই দিয়েছে, কারণ সে ভেবেছে এ-দেবত্ব বুঝি তার আয়ত্ত হবার নয় । বোধ হয়, আমার ধারণা, এই দেবত্বের অভিজ্ঞতা তার হতে পারে । সংসারে যাঁরা মহৎ, যাঁরা সাধক, তাঁদের হয়ত হয় ।"

সংসারে অনেক কাজই তো ছিল, কিন্তু সুরেশ্বর অন্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গেল কেন ?— অবনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সুরেশ্বর জানিয়েছে, —

"এই কাজটাই আমার ভাল লাগল ।"

"অন্ধ আতুর সেবা ।"

"দুঃখীজনের সেবা ।....আমিও তো অন্ধ ।"

যন্ত্রণার জগতে—ব্যর্থতার পটভূমিতে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হলে কিছু সান্ত্বনা অন্তত মেলে, —এটাই সুরেশ্বরের অভিমত,

"মানবজীবনের একটা দিক এই রকমই । দুঃখের জগতে, যন্ত্রণার জগতে আমরা জন্মেছি । তেমন করে দেখতে গেলে ব্যর্থতাই মানুষের নিয়তি ।....তবু ...." অবনী অপেক্ষা করে থাকল । সুরেশ্বর বলল, "তবু জগতের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে কর্ম দিয়ে যে জড়িত তার সান্ত্বনা আছে । আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচতে পারি না । অবিশ্বাস করে, দূরে সরে থেকে, পালিয়ে যদি বাঁচা যেত আমি বাঁচতাম ।"

যে মানুষটি নিজস্ব প্রাপ্তিগুলিকে অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে অন্যকিছুর অপেক্ষায় রয়েছে, সেই সুরেশ্বরের প্রতি অবনী গভীর সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হল, প্রার্থনা করল, —

ওই মানুষটি যেন কিছু পায় ।

কিছু পায় ।

উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায় নশ্বর পৃথিবীতে আমরা ভাল-মন্দ নিয়ে যতই মাথা ঘামাই না কেন, চরম বিচারে সব কিছুই অনিশ্চয়তার ছায়ায় আবৃত । আমরা নিশ্চিতরূপেই জানি কোনও মানুষই পূর্ণ নয়, যদিও পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদে অনেকেই অনেক প্রাপ্তিকে হেলাভরে পরিত্যাগ করেছে ।—এই রকমই একজন মানুষের নাম সুরেশ্বর । এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে তার দাবি অনস্বীকার্য । সুরেশ্বর পৃথিবীর গভীর অসুখ —তার কালো

ছায়া প্রত্যক্ষ করেছে। সে বুঝতে পেরেছে আপাত দৃষ্টিতে অনেক কিছুই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য হলেও চরমতম মূল্যায়নের মানদণ্ডে তার ভূমিকা যৎকিঞ্চিৎ। হৈমন্তীকে ভয়ঙ্কর ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে সে প্রাণপাত করেছে। হৈমন্তীও সুরেশ্বরের জীবনের সঙ্গে নিজস্ব আত্মাকে মিলিয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কিন্তু হেমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মানবের যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট তার অজানা নয়। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য; — নির্মলার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি তাঁর মনে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিষ্ক্রিয় হয়ে নয়, কর্মের ভিতর দিয়েই সুরেশ্বর শান্তি আর সান্ত্বনার পরশ অনুভব করতে চায়। গুরুডিয়ার বুকে তাই অন্ধজনে আলো দেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্ধ-আশ্রম। এই প্রসঙ্গে শুরুর শুরুতে উপন্যাস-শিল্পী উপনিষৎ থেকে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তা বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য :

যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি।নো ইতরানি।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥ ১.১১.২
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

নির্মলার জীবনের মধ্যেও পরিস্ফুট হয়েছে অসুখের ছায়া। ক্ষীণ দৃষ্টির মেয়েটি জানত—যে কোনও দিনই সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে; যদিও তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না তার। সুরেশ্বরের মনে হয়েছিল নির্মলা মানব-চরিত্রের অসহায়তার দিকটিকেই নির্দেশ করছে। দুঃখ এবং যন্ত্রণাই যেন মানব ভাগ্যের চরম পরিণতি। অবশেষে নির্মলা আগুনে পুড়ে মারা গেল। নির্মলার মৃত্যু সুরেশ্বরের কাছে অসহ্য ঠেকেছে। সর্বদাই এক প্রশ্ন তাঁকে উদভ্রান্ত করে বেড়াত। মৃত্যু-ব্যাধি বিজড়িত এই জীবন কত অসহায়—নির্মলাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুরেশ্বরও তা বুঝেছিল।

অবনী চরিত্রটির মধ্যেও স্পষ্টত প্রকাশ ঘটেছে সুখ বর্জিত জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা। সুরেশ্বরের মত অবনীর পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ও গৌরব হীনতায় আক্রান্ত। স্থূল কামনা-বাসনার পরিণাম যে কত মর্মান্তিক হতে পারে,—অবনীর বিধ্বস্ত দাম্পত্য-জীবন তা প্রমাণ করেছে। ললিতা অবনীর জীবনের দুঃসহ এক ক্ষত। অবনী নিজে তার অসুখের জন্যে কিয়দংশে দায়ী হলেও সন্তানের প্রতি তার সস্নেহ মনোভাব, সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের জন্যে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, হৈমন্তীর স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করা, — তাকে উত্তরণের তীর নির্দেশ করবে সন্দেহ নাই। সুরেশ্বরের

শিকার মনোহর , তিলুয়া , হরিকিষেণের ভাই । কোনওরকমে বেঁচে গেছে গির্জা । বন্ধ হয়ে গেছে অন্ধাশ্রমের কাজ । অন্ধ-আশ্রম এখন হাসপাতালে রূপান্তরিত । সেখানে এখন ডাক্তার , নার্স , কম্পাউন্ডার , জমাদারদের ব্যস্ততা । সব্জি বাগানের গন্ধ উধাও । পরিবর্তিত বাতাসে ব্লিচিং পাউডার আর ফিনাইলের উগ্রতা ।

এত কিছু সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য : শিল্পী-সাহিত্যিক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র তার ভয়ঙ্করত্বকেই প্রত্যক্ষ করলেন না ; একই সঙ্গে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন আগুনের মধ্যে জেগে থাকা অবিনাশী সত্য-স্নিগ্ধ রূপটিও । এই নিরিখে সমগ্র উপন্যাসটিই আমাদের যাবতীয় হিসেব-নিকেশ —মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দলিল । মানুষের অসুখ , যন্ত্রণা , হতাশা , ব্যর্থতা , —এই সব কিছুর মধ্যেই শিল্পী সন্ধান দিলেন কর্মময়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার —সান্ত্বনা পাওয়ার শান্ত দিকটি । ঔপন্যাসিক মনে রেখেছেন জীবনের পরিধি বিশাল । জীবনের কথাকার তাই এক বুক বেদনা নিয়েও নতুন করে যা আঁকড়ে ধরা যায় , — গ্রহণ-বর্জন ও পরিমার্জনার ভিতর দিয়ে যা স্বাভাবিক হয় , — তার প্রতি দৃষ্টি-ক্ষেপ করলেন । বলা যেতে পারে এখানেই জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা । শুধুমাত্র নিছক কোনও আদর্শের অনুসরণ নয় , কান্না-হাসির আকুলতায় উদ্বেল , ভালবাসার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল এই পৃথিবী তার যাবতীয় বিষাদকে উপেক্ষা করেই আমাদের অভ্যর্থিত করতে প্রস্তুত ; এই কথাটি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে লেখক দ্বিধাগ্রস্ত হননি । এই কারণেই তীব্র অ-সুখ অগ্রাহ্য করেও হৈমন্তী ও অবনী মনে জোর আনে ; সামনের দিকে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয় । একই সঙ্গে নির্মল ভাবনায় সমাচ্ছন্ন সুরেশ মহারাজের প্রতি সমবেদনায় আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না ; ভুল হয় না এই নিস্পৃহ কর্মযোগী মানুষটির প্রতি কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে ।

ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ যুব সমাজের আত্মধ্বংসী কার্যকলাপের পটভূমিতে রচিত 'যদুবংশ' (১৯৬৮) উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন দৃষ্টির নিদর্শন । বিপথগামী যুবগোষ্ঠীর চরিত্রটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে গিয়ে লেখক শুধুমাত্র তাদের

বিস্ফারণকেই প্রাধান্য দেননি, একই সঙ্গে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ব্যর্থার্ত প্রাণের নির্জনতাটুকুও। এই সব চরিত্রগুলি যেন "এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রক্তাক্ত যুবমানসের প্রতিনিধি। এদের বুকের মধ্যে নেই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-বিশ্বাস বা আত্ম-বিশ্বাস, আছে সংশয়, শূন্যতা, জীবনের মূল্যবোধ হারানোর বেদনা।"[৫]

'যদুবংশ' —এই নামকরণ একান্তই রূপকাশ্রয়ী। যদুবংশের মত এই সমাজের নবীন নায়কেরাও নিজেদের ছিন্নভিন্ন করেছে, রক্তাক্ত হয়েছে। এই সকল যুবকেরা নিয়ন্ত্রণাতীত। যে পরিস্থিতি-পর্বে তারা পৌঁছে গেছে, সেখানে থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নাই বললেই চলে।

চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বসে
কেবলই পড়িতে আছে; ....

(জীবনানন্দ, 'আমিষাশী তরবার')

অধঃপতিত যদুবংশের করুণ পরিণতি অসহায়ের মত কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল, এমনিভাবেই গণনাথকেও। নিজের জীবনের বিনিময়ে সে সূর্য-বুলবুলি-অভয়-কৃপাময়দের নাড়া দিয়ে গেছে; নতুন করে ভাবিয়েছে তাদের। তারা যে ভয়ঙ্কর অসুস্থতায় আক্রান্ত—সে কথাও এমনিভাবেই জানিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছে গণাদাকে।

কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় সূর্য, বুলবুলি, অভয় ও কৃপাময় --এই চার যুবকের পদচারণায় বিভ্রান্তি ও লক্ষ্যহীনতার ছাপ স্পষ্ট। এদের মধ্যে সবসময়েই আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ক্রিয়াশীল, সে কথা বলা চলে না। সমস্তপ্রকারের নৈতিকতাবিহীন এক ভয়াবহ দুঃসময়ের ভিতরেই তারা নিজেদের অস্তিত্বকে জানান দিতে চেয়েছে। একটি জায়গাতে ওদের চারজনেরই মিল, —সহানুভূতি ও সমবেদনার জগৎ থেকে তারা সম্পূর্ণই নির্বাসিত। যাদের সস্নেহ আচরণ -ভালবাসা এই সকল চোখের যাবতীয় রুক্ষতাকে মুছে দিতে পারত, তাদের উপর কোনও সময়েই আস্থা রাখতে পারা যায়নি। শুধু তাই নয়, কখনও-কখনও তাদের রুচিহীন নীতিবিবর্জিত অবিবেকী কাজ-কারবার এই সকল যুবকদের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

উপন্যাসের মধ্যে একজনমাত্র মানুষকে পাওয়া যায় —যে মমতায় এবং প্রতিরোধে অবিচল; মূল্যবোধে অভ্রান্ত। মানুষটির নাম গণনাথ। ভালবাসাই তার জীবনের মন্ত্র।

এই গণাদা একদা সকলের কাছে ছিল আদর্শস্বরূপ । সূর্যরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত । কিন্তু সময় অনেক কিছুই বদলে দেয় । তবু গণাদা চেষ্টা করে এই সব বেপরোয়া যুবকদের কিছুটা হলেও সংযত করতে । এর জন্যে তাকে মূল্যও দিতে হয় । চরম মূল্য ।

সূর্য তাদের বংশের সোনার 'জন্মমুখী প্রদীপ' বেচে দিয়ে সেই টাকায় হয়তো মদ খেত । এমন দামি সুন্দর জিনিসটা এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাক—গণাদা চায়নি । সহস্র অপমান ও কষ্টের ভিতরেও পরোপকারের ইচ্ছাটুকু তাঁর মনে জীবন্ত থেকেছে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য কৃতঘ্ন দুনিয়াতে শ্বাসরোধকারী অন্ধকারের মধ্যেই তাঁকে তলিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মহনন সেই সব বুকের ভিতর ঝড় তুলেছে; যারা এতকাল অন্যকিছু ভাবনাতে অভ্যস্ত ছিল না ।

উপন্যাসের প্রথমাংশেই সূর্য, বুল্‌লি, অভয় ও কৃপাময় —এই চার যুবকের কথাবার্তা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না —তারা ঠিক কোন স্তরে পৌঁছে গেছে । গণাদার খোঁজ করছিল ওরা তখন ।

> রাস্তায় তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল । বুল্‌লি ফিরে এসে বলল, "হুড়কো দিয়ে ভেগে পড়ল রে । ...আচ্ছা শালা, কাল দেখব ।"
>
> অভয় বলল, "কি দেখবি, কালকেও একই ধুয়ো গাইবে ।"
>
> বুল্‌লি বলল, "ও মেয়েছেলের আঁচলের তলায় শুয়ে আছে মাইরি । আমার বেট্ থাকল। শালা গণাদাটা কাওয়ার্ড ।"
>
> সূর্য বলল, "হারামী," বলে থামল, পরে আবার বলল, "...ভাল রামনা পেয়েছে, খুব চরছে । চরুক, আমার টাকা আমি আদায় করে নেব ।"
>
> কৃপাময় কিছু বলল না, হাসল ।

এই গণাদা একদা সকলের কাছে ছিল আদর্শস্বরূপ । সূর্যরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত । কিন্তু সময় অনেক কিছুই বদলে দেয় । তবু গণাদা চেষ্টা করে এই সব বেপরোয়া যুবকদের কিছুটা হলেও সংযত করতে । এর জন্যে তাকে মূল্যও দিতে হয় । চরম মূল্য ।

সূর্য তাদের বংশের সোনার 'জন্মমুখী প্রদীপ' বেচে দিয়ে সেই টাকায় হয়তো মদ খেত । এমন দামি সুন্দর জিনিসটা এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাক—গণাদা চায়নি । সহস্র অপমান ও কষ্টের ভিতরেও পরোপকারের ইচ্ছাটুকু তাঁর মনে জীবন্ত থেকেছে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য কৃতঘ্ন দুনিয়াতে শ্বাসরোধকারী অন্ধকারের মধ্যেই তাঁকে তলিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মহনন সেই সব বুকের ভিতর ঝড় তুলেছে; যারা এতকাল অন্যকিছু ভাবনাতে অভ্যস্ত ছিল না ।

উপন্যাসের প্রথমাংশেই সূর্য, বুল্‌লি, অভয় ও কৃপাময় —এই চার যুবকের কথাবার্তা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না —তারা ঠিক কোন স্তরে পৌঁছে গেছে । গণাদার খোঁজ করছিল ওরা তখন ।

> রাস্তায় তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল । বুল্‌লি ফিরে এসে বলল, "হুড়কো দিয়ে ভেগে পড়ল রে । ...আচ্ছা শালা, কাল দেখব ।"
>
> অভয় বলল, "কি দেখবি, কালকেও একই ধুয়ো গাইবে ।"
>
> বুল্‌লি বলল, "ও মেয়েছেলের আঁচলের তলায় শুয়ে আছে মাইরি । আমার বেট্ থাকল। শালা গণাদাটা কাওয়ার্ড ।"
>
> সূর্য বলল, "হারামী," বলে থামল, পরে আবার বলল, "...ভাল রামনা পেয়েছে, খুব চরছে । চরুক, আমার টাকা আমি আদায় করে নেব ।"
>
> কৃপাময় কিছু বলল না, হাসল ।

সূর্যর দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি দিদি বিজয়ার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক —তা অহি-নকুলের । কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না । দুজনের ঝগড়া প্রায়ই কুৎসিত পর্যায়ে নেমে আসে । দিদিকে সহ্য করতে না পারলেও ছোট ভাগ্নে ছোকনুর ওপর তার দুর্বলতা আছে একটু । ছোকনু দুর্বল ও অসুস্থ বলেই হয়তো ।

> ছোকনু ঘুড়িটা বারান্দার ওপর টেনে টেনে
> গুড়াতে গুড়াতে ছাতা আনতে চলল । তার
> হাঁটা টলমলে । বাঁ পায়ে জোর পায় না ,
> পায়ের পাতা থেকে হাঁটু অবধি সরু , সামান্য
> বাঁকা । ঠিক যে কি হয়েছিল ছোকনুর সূর্য
> জানে না । খুব জ্বর হয়েছিল একবার , শরীর
> আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল , টাইফয়েড , টাইফয়েড
> বলত বাড়িতে , পরে শুনেছিল অন্য রোগ , পোলিও ।

ছোকনুকে দেখে সূর্যের মনে কষ্ট হয় । তার মনে হয় দিদির ব্যভিচারে-পাপে বেচারার এই দুর্গতি । সূর্য তার বাবার প্রতিও ঠিক সন্তুষ্ট নয় । তার বাবা কামাখ্যাবাবু হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান । শহরে ভদ্রলোকের এতটুকু সুনাম নাই । অধিকাংশ লোকই গালমন্দ করে , তবুও তিনি কীভাবে যে জিতে যান —সেটা সূর্য বুঝে উঠতে পারে না কোনও মতেই ।

চারমূর্তির অন্যতম অভয়ের পারিবারিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয় । বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনেক কটু কথাই তাকে হজম করতে হয় । অভয় তার বন্ধুদের 'বাসি মুখে জুতো খাওয়ার ' যে বিবরণ শুনিয়েছে , --তাতে স্তম্ভিত হতে হয় । মায়ের গালিগালাজ অভয় হুবহু বন্ধুদের শুনিয়েছে :

> বাপের পয়সায় খাচ্ছিস আর ডঙ্কা বাজাচ্ছিস,
> গলায় দুটো বোন ঝুলছে , এত বড় সংসার ,
> একজন তো বিয়ে করে বউ বগলে করে মোগল-
> সরাই পালাল , আর একজন রাস্তার ষাঁড় হয়ে
> ঘুরে বেড়াচ্ছে । লজ্জা করে না তোদের ,
> একটা মানুষ আগুনের আঁচে রক্ত শুকিয়ে পয়সা

আনছে, আর তোরা খাচ্ছিস দাচ্ছিস
ঘুরে বেড়াচ্ছিস। নেমকহারাম, নচ্ছার
কোথাকার। এ সব শুয়োরের জাত আবার
মানুষ পেটে ধরে। মরগে যা —। যার
কথাগুলো বলতে বলতে অভয়ের গলা মিইয়ে
মুখ ম্রিয়মাণ হল।

চাকরির জন্যে সূর্যরা চারুবাবুর কাছে এলে স্বভাবজাত ধূর্ততার সঙ্গে তিনি যেভাবে তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীকে ভালমতই শনাক্ত করা সম্ভব। চারুবাবু 'মানসিক শান্তির' ওপরে গুরুত্ব দিতে পরামর্শ দিয়েছেন; কিন্তু তার সুদীর্ঘ বক্তব্যে সূর্যদের মনের শান্তি উবে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরেও যে আগুন ধরে গেছে — সন্দেহ নাই।

চারুবাবু বললেন, "আর একটা ফ্যাসাদ হল, প্রেসার। প্রেসারের আজকাল ছড়াছড়ি। তোমার বাবার প্রেসার কি রকম?" সূর্য কিছু খেয়াল না করেই বলল, "খুব"। "খু-ব। কত?"
চারুবাবু যেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। "হাই প্রেসার ভাল না। মোস্ট ডেনজারাস। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস হামেশা হচ্ছে। আমাদের ফ্যাকটরীতে দিন পনেরো আগে কোকোভ্যানের একটা ফোরম্যান, হাউলি ফিফটি টু থ্রি হবে, ফ্যাকটরীতেই মারা গেল।...তোমার বাবা কি খাচ্ছেন? আজকাল প্রেসার লো রাখার অনেক ওষুধ। আমার একটু হয়েছিল, কদিন একটা ট্যাবলেট খেতুম, বিলেতী। তা সূর্য, তোমার বাবাকে ওটা খেতে বলতে পার। ...দি আদার থিং, পিস্ অব মাইন্ড। মনের শান্তি দরকার। হইহই, হুড়োহুড়ি, কাজ কাজ কাজ, রাজ্যের ওয়ারি — মানে দুশ্চিন্তায় আমাদের

নার্ভে কনস্টান্ট প্রেসার পড়ে । দ্যাট ইজ
ব্যাড ফর হেল্‌থ ।"

সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় এই সব ছেলেগুলির দিকে ন্যূনতম সহযোগিতার হাতটুকু কেউ বাড়িয়ে দেয় না । ওদের হতাশা ক্রমশ বাড়তেই থাকে । হতাশা থেকে জন্ম নেয় দুর-ত আক্রোশ ।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ক'পা এগিয়ে এসে অভয় বলল, "লোকটা মাইরি পয়লা নম্বরের হারামী । চাকরী না হবে না হোক, পাড়ার ছেলে গেছি— একটু শুনবি তো কথা — তা না শুধু নিজের কথা ।"
কৃপাময় একমুখ ধোঁয়া বুকে টেনে যেন বুকের ফাঁকা ভাবটা ভরাট করল । তারপর ধোঁয়া ফেলতে ফেলতে জ্বালাধরা গলায় বলল, "এই শালারা তো এই রকমই রে । তোর উপকার তো করবেই না । মন দিয়ে তোর কথাটা শুনবে না । খালি শালা লেকচার । লেকচারের বাচ্চা সব ।" চার ব-ধুই আর কোনো কথা বলল না, চুপচাপ হাঁটতে লাগল ।

বুল্‌নির বাবা দারোগা । রিটায়ার করার সময় হয়ে এসেছে । অবশ্য তিনি বুদ্ধিমান মানুষ, সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে কোনও কসুর করেননি । ব্যবসাদার, মদের দোকান, দাগি আসামী, এমন কী পানঅলা বিড়িঅলাদের কাছ থেকে পর্যন্ত প্রণামী পান তিনি ।

রাজা সিংহাসনে বসতে পায় বলে তার কাছে লোকে মাথা নুইয়ে প্রণামী ঢেলে যায়; যাও না শালা শিবমন্দিরে, পুরুতের থালায় অনবরত পয়সা পড়ছে; যেখানে যা প্রাপ্য তা নিতে দোষ কোথায় । বুল্‌নি কোন দোষ দেখতে পায় না । বাবার চেয়ার বড় দারোগার, যদি লোকে চেয়ারের দাম দেয়, বাবা নেবে না কেন ?

বুল্‌লিদের বাড়িতে তার বউদি অর্থাৎ মৃদুলাকে নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকে । বিয়ের আগেই তার দাদা একটা 'কেচ্ছা' করে ফেলেছিল । দারোগা বাবার পক্ষেও ব্যাপারটা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি । এমনিতেই মৃদুলার ওপর বাড়ির সকলে অপ্রসন্ন ; বুল্‌লি অবশ্য তেমন একটা ঝামেলার মধ্যে যায় না । সেদিন কিন্তু সেও নিজেকে সামলাতে পারল না । সামান্য কথা-কাটাকাটি থেকে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল । পারিবারিক সম্পর্ক যে কতখানি ফয়াটে হয়ে উঠেছে তা যুযুধান দুজনকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না ।

মৃদুলা কোন রকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল, "সভ্যতা ভদ্রতা কিছু শেখো নি ?" বুল্‌লি বিদ্রূপ করে জবাব দিল ।" ভদ্দরলোকের বাড়ির বি এ পড়া ছুঁড়ি তো নই গো, শিখব কোথা থেকে ?"

মৃদুলার মাথা আরও গরম হয়ে উঠল, "শেখো নি যে তা তো দেখতেই পাই, লেখা-পড়া শিখলে নিজের বউদিকে ছুঁড়ি বলতে না। ভদ্দরলোকের বাড়ির শিক্ষা পেলেও কথা বলতে শিখতে । তাও শেখো নি ।" বুল্‌লির মাথায় রাগ চড়ে গেল । "তোমার বাপের বাড়ির ভদ্দরলোকেরা তো নিজের মেয়ে বোনকে রাস্তায় ছেড়ে দেনায় । তোমায় যেমন দেলিয়ে ছিল ।"

মৃদুলা স্থান কাল ভুলে কেমন যেন ক্ষিপ্ত চিৎকার করে উঠল । তার চোখ দোরা ও ইতর হয়ে জ্বলছিল ।"ছোট লোক, নোচ্ছা, লোফার কোথাকার ।" মুহূর্তের মধ্যে বুল্‌লির সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেল, যে কোন মুহূর্তে সে মৃদুলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ক্রুদ্ধ পশুর মতন তাকে

হিংস্র, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল, "কি বললে।
ছোটলোক, লোচ্চা।...এক থাপ্পড়ে,
তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।"
বুলনি রুখে উঠল, "ডাঁট করার জায়গা
পাও নি, যত শালা বেজন্মার বংশ ...।
হাটো হিঁয়াসে ... চলে যাও। গলা
টিপে মেরে ফেলব তোমায়। যাও—চলে
যাও বলছি।"

কৃপাময় যে বাড়িতে থাকে, যে পরিবারের মানুষ —সেখানেও জমাট অন্ধকার। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, কৃতঘ্নতা, চরিত্রহীনতা, শঠতা, — এই সব কিছুই তার দুনিয়াকে নিঃস্ব করে ফেলেছে। কৃপাময়ের বাবা যাদের বুক দিয়ে আগলেছেন, কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন, —সেই ভাইরা উপযুক্ত হয়ে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলেছে। কৃপাময়ের মা আজ বদ্ধ পাগল। এখন কৃপাময়ের একমাত্র সান্ত্বনা আর আশ্রয় হল ছোটকাকি। ওদের অহঙ্কার আর ভণ্ডামি সেই ছোটকাকিকেও আর সহ্য করতে পারছে না। বাইরে থেকে সবাই বলে বনেদি বাড়ি। কিন্তু লোক-দেখানো চাকচিক্যটুকু বাদ দিলে ভিতরকার যে পঙ্কিলতা— তার সন্ধান ক'জন রাখে? চরম হতাশায় কৃপাময় নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দেয়।

আসলে কৃপাময় এ বাড়ির সব নোংরামি জানে,
শুধু নোংরামি নয়, নিষ্ঠুরতাও। মাকে ওরাই
পাগল করেছে। ঠাকুমা, বাবা, কাকারা,
পিসিরা। মার সর্বস্ব ওরা শুষে নিয়ে মার
শেষ সম্বল স্বামীটিকে গলা পর্যন্ত সংসারের
নোংরা মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেখিয়েছে মা কত
অসহায়। সেই নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় মা
একেবারে উল্টো মুখ হয়ে ধর্মকর্ম শুরু করল।

যার যতটুকু বা জ্ঞানগম্যি ছিল ; ঠাকুরের
পাল্লায় পড়ে তাও নষ্ট হল । বাবার মতন
মাও এদের অন্যায় ও নোংরামির বিরুদ্ধে
লড়ল না , তেজ দেখাল না , শাসন করল
না , পিঠ নুইয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে গেল ।
এমন কি মা দেখল না তার ছেলে এই সংসারে
আবর্জনার মতন বেড়ে উঠতে লাগল । বাবাও
সেটা দেখে নি ; ভাবত—নিজের ছেলের দিকে
চোখ দেওয়াটা লজ্জার , স্বার্থপরতার । মা
একেবারেই চোখ ফিরিয়ে নিল , যেন কৃপাময়
এ বাড়িতে যার অবৈধ সন্তান ।

উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ দুটি নারী চরিত্র —মালা ও জয়ন্তীর যে পরিচয় ধরা পড়েছে , তার মধ্যে বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ লক্ষণীয় । মালার জন্যে সূর্যর মনে যে তৃষ্ণা তা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থনযোগ্য না হলেও যৌবন -উদ্দামতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ; কিন্তু মালা এবং জয়ন্তী —এই দুই নারীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেযে আভাস সূর্য পেয়েছে , — সেখানে শুধুই বিকৃতি : যা একধরনের অসুস্থতাই ।

উপন্যাসটিতে নয়না-যমুনা-রত্নার যে বিবরণ পাওয়া গেছে — তাতে বলা যায় এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তারা কোনওরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে । যে কোনও ভাবে টিকে থাকার চেষ্টা ।

সেলাইদিদির সামান্য আয়ে তিনজনের সংসার
কি চলে । তবুও চালিয়ে বা টেনেটুনে যতটা
পেরেছে নিয়ে গেছে নয়না । সেই দুঃসময়ে যে
কিভাবে জল গড়িয়েছে ভাবলে ভয় করে । সে
কী কাদাটে নোংরা জল , বাড়ি ভাড়া জোটে নি,
দুবেলা দুমুঠো ভাল ভাত জোটাতে পারে নি নয়না ;

দুবোনে ভাগাভাগি করে একই সায়া শাড়ি
পরেছে, একই চটিতে দুবচ্ছর চালিয়েছে।
মান সম্মান তো ছিলই না, উপর-তু নানান
নোংরামির মধ্যে নিজেরাও যেন নিজেদের
অপমান করত, খামচাখামচি করত। যে—
নয়না মায়ের মতন করে ছোট দু-বোনকে মানুষ
করেছে সেও কামনা করত, নয়নাকে ওরা মুক্তি-
দিক, যেভাবে হোক, যেমন করে হোক।

নয়নার কাছে মেজবাবু যখন আসত—অপবাদের গঞ্জনা সত্ত্বেও অনেক ঝামেলার হাত থেকে রেহাই মিলত তখন। কি-তু মেজবাবু যারা যাওয়ার পর রীতিমতই উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ-ই সে-দিন গণনাথের সঙ্গে নয়নার দেখা। নয়না অবশ্য গণনাথকে আগে থেকেই চিনত।

কি কাজে যেন গণনাথ এসেছিল একদিন এ
পাড়ায়। খোঁজ নিয়ে এসেছিল নয়নাদের সঙ্গে
দেখা করতে। গণনাথের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা
হত অবশ্য আগে, ইদানীং আর বড় হয় নি—
গণনাথকে দেখে নয়না অবাক। শরীর স্বাস্থ্য
ভেঙে কি রকম হয়ে গেছে। বয়সটা বড় বড়
দেখায়, মুখে চোখে শুকনো মলিন ভাব; আগের
মতন প্রাণ নেই; হাসি নেই, সজীবতা নেই।
নয়নার বড় দুঃখ হল, মায়া হল। পেটের
একটা ঘায়ে নাকি ভুগছে অনেকদিন, মেস আর
সহ্য হচ্ছে না।

অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক গণনাথের মত সজীব প্রাণবন্ত মানুষটিকেও কাহিল করে তুলেছে। নয়না গণনাথকে তাদের কাছে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। গণনাথ প্রথমদিকে সম্মত হতে না চাইলেও পরে রাজি হয়ে গেল। নয়নাও স্বস্তি পায়।

সূর্য, বুলি, অভয় আর কৃপাময় — চারজনই নয়নাদের বাড়িতে চড়াও হয়েছে — উদ্দেশ্য, সোনার প্রদীপটা গণাদার কাছ থেকে আদায় করা। সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবুর কানে ঘটনাটা পৌঁছে দিয়েছে তার দিদি। ফেরৎ নিয়ে যেতে না পারলে সর্বনাশ। সুতরাং প্রদীপটা চাই-ই। গণনাথকে চরম অপমানিত হতে হয় ওদের হাতে। নয়না-যমুনা-রত্নাকে জড়িয়ে অশ্রাব্য মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেও ওদের বাধে না।

গণনাথ রাগের মাথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠে দাঁড়াল, রাগে হাত পা থর থর করে কাঁপছে। সোজা দরজার দিকে আঙুল দেখান, "যা বেরিয়ে যা! ... হট্। চলে যা এখান থেকে; বদমাশ, পাজী, লোফারের দল সব।....চলে যা, বলছি।"

মুহূর্তের জন্যে সূর্যর যেন কেমন হয়েছিল, তারপর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। "আমরা লোফার, আর তুমি শালা তিনটে মাগী নিয়ে ঘরে হারেম বসিয়েছ। লোকের পয়সা মেরে খাচ্ছ! তুমি শালা কি?"

* * * * * *

গণনাথ বলল, "মাতাল, লোফার, লোচ্চার দল কাঁহাকার! ...বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি।"

"চোপ রাও। শালা চোটা, হারামী..." সূর্য বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করল।

গণনাথ মিছে-মিছে এই অপবাদ আর সহ্য করতে পারছিল না। সত্যিই সে তো মূল্যবান প্রদীপটা ফেরে দিতে চায়নি; শুধু নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে সেটা বাঁচাতে চেয়েছে মাত্র। বাকল হাতড়াতে হাতড়াতে গণনাথ বলে :

"আমি চোর । ...তোরা আমায় চোর বললি । ...আচ্ছা, এর জবাব আমি দেব । ঘরের অমন জিনিস তুই চুরি করে এনেছিলি, বেচে দিতিস ।...আমি নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তোকে নিজের থেকে টাকা দিয়েছি; ভেবেছিলাম তোকে বুঝিয়ে সুজিয়ে একদিন বাড়িতে রেখে আসতে বলব । ...তোর বাবাকে আমি দিয়ে আসতে পারতাম শুয়োর, তোর দিদিকে আমি দিয়ে আসতে পারতাম, দিই নি—তুই ধরা পড়ে যাবি বলে। ... তুই আমায় চোর চোটা ভাবলি । আমি চোর চোটা না তোরা । ... আমি নিয়ে না রাখলে ও জিনিস তুই আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস, রাস্কেল স্কাউন্ড্রেল; বেচে দিতিস, দিয়ে মদ খেতিস ... । অমন পুরনো সুন্দর জিনিসের মর্ম বোঝার ক্ষমতা আছে তোর, ইডিয়েট । ... আঃ, দেখতে পাচ্ছি না । নয়না, আলোটা দাও । ... দিয়ে দিই খুঁজে ওর জিনিস; নিয়ে বেরিয়ে যাক এ বাড়ি থেকে । ..."

অপরের উপকার করতে গিয়ে গণনাথ কি-তু আজ প্রকৃতই নিঃস্ব । অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ওটাকে সে খুঁজে পায় না । সূর্য হয়তো খুন-ই করে ফেলত গণনাথকে । ওদের হাতে প্রচ-ড লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে সে । কে ওটা সরিয়ে নিল ? জিনিসটা চুরি করল কে ? নয়নার সন্দেহ — অন্য কেউ নয়, যমুনা । সেই ওই দামি জিনিসটা হাতিয়ে সম্ভবত তার মনের মানুষের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে ।

ভালবাসাই যাঁর জীবনের সম্পদ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস যাঁকে স্বাতন্ত্র দিয়ে এসেছে, —সেই গণনাথ এই অকৃতজ্ঞ বেইমান পৃথিবীতে বাঁচবে কোন বিশ্বাস নিয়ে ?

কোন মূল্যবোধ এর পরও তাঁকে প্রেরণার, উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখাবে ? তাই আফিং-এর বিষেই সে বোধহয় সমস্ত জ্বালা জুড়াতে চাইল, না কী নীরব প্রতিবাদ। গণাদার আত্মহত্যার খবর পেয়ে কেঁপে উঠেছে সূর্য।

> শালা গণাদাটা আফিং খেল। পিদ্দিমটা গেল যাইরি। চোদ্দ পুরুষের হয়েতে দেবার সলতে আর পাকাতে হবে না। সূর্যর হঠাৎ কি রকম ছেলেমানুষের মতন হাসি-কান্নার দমক এল; যাও শালা, আমায় তুমি ধাপ্পা মেরে গেলে, ঠকিয়ে গেলে। চোটা কাঁহাকার।
>
> আর একবার হঠাৎ সূর্যর কেমন করে যেন সন্দেহ হল, গণাদা ওদের জন্যেই আফিং খেল না তো। ...মনে পড়ার পরই সূর্য মাথা নাড়ল, না—না, তাদের জন্যে কেন খাবে।

মদের দোকানে বসে সূর্যরা মদ খাচ্ছিল। হঠাৎই তাদের কানে হরিধ্বনি ভেসে এল। গণাদাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদের বুকে তোলপাড় শুরু হল কেন ?—কিসেরই বা যন্ত্রণা ? —গণাদা তাদের কে ছিল ? অন্যান্যবারের মতই মৃত্যুর পরেও গণনাথ উদ্‌ভ্রান্ত ওই যুবকদের নাড়া দিয়ে গেল; কড়া নেড়ে গেল তাদের ঘুমন্ত বিবেকের দরজাতেও।

বিশিষ্ট নিবন্ধকার ড. অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর প্রবন্ধে 'যদুবংশ' সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছেন তা উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে :

> ''মৌষলপর্বের দুটো উপাখ্যান আছে —এক, যদুবংশের ধ্বংসকাহিনী; দুই, অর্জুনের অক্ষমতা-ব্যর্থতার কাহিনী। সূর্য, বুলনি, কৃপাময়, অভয় সব এক ধ্বংসোন্মুখ যদু-বংশের সন্ততি। বাড়িতে বাড়িতে অসূয়া-

বিদ্বেষ—মায়ের সঙ্গে অভয়ের, দিদির সঙ্গে সূর্যর, বৌদির সঙ্গে বুলবুলির কুৎসিত ঝগড়া। একদিকে প্রেমহীন যৌনসম্ভোগ, ব-ধ্যাত্ব বা বিকৃত যৌনতার ছবি, অন্যদিকে সুরাসক্তি। এদেরই যেন বর্ণনা করেছিলেন সমর সেন প্রায় তিরিশ বছর আগে—

কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল মাতাল ...।

(বকধার্মিক)

চার ব-ধুর মধ্যে চাপা হিংস্রতা যে-কোনো উপলক্ষ নিয়ে হিসিয়ে ওঠে। এই অংশে গণনাথ যেন কৃষ্ণেরই প্রতিভূ—'আমাদের এনিথিং, লীডার গণাদা।' এই গণনাথ মানুষের স্বাধীনতার কথা বলত, বলত, 'চাকরি করব না, ছোটো হয়ে যেতে হয়, নোংরামিতে থাকব না, মন নষ্ট হয়ে যায়।'

দ্বিতীয় অংশে এই গণনাথের উপরে যেন অর্জুনের ছায়া-সম্পাত ঘটেছে। তখন সূর্য-বুলবুলি ইত্যাদি গোপদস্যুদের হাত থেকে গণনাথ নয়না-যমুনা-রত্নাকে বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করে হেরে যায়। যখন গণনাথ ওদের দ্বারা আক্রান্ত তখন, 'অনেক দিন পরে সেই পুরনো গণনাথের ঝলসে ওঠা চোখ ও গলার সুর যেন ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে সাময়িক। সে গণনাথ আর নেই।' অর্জুন যে যাদবনারীদের রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, তাদের সকলে কিন্তু রক্ষিত হতে ব্যস্ত ছিল না—'অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দস্যুগণের অধীন হলো।' গণনাথের দ্বারাও তিন বোনের সকলে রক্ষিত হতে চায়নি। যমুনা লোভের বশে বেচে দিয়েছে সোনার প্রদীপ, ছেড়ে দিয়েছে গণনাথের

আশ্রয় । সূর্যদের পরিবারে বংশানুক্রমিকভাবে এই সোনার 'জন্মমুখী প্রদীপ' ব্যবহৃত হতো নবজাত সন্তানের মুখ দেখার সময় । দিদির পঙ্গু দুর্বল ছেলে ছোকনুর পরেই ইঙ্গিত আছে, নির্বংশ হবে এই বংশ — 'জন্মমুখী প্রদীপ'—ও তাই চিরকালের জন্যে অপহৃত হয়ে গেল । উনিশ শতকে যে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব একশো বছরের মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত হয়ে গেল উত্তরাধিকারহীন দেউলে । আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নায়কেরা সবাই প্রায় পরাজিত নায়ক । কিন্তু মধুসূদনের রাবণ বা রবীন্দ্রনাথের কর্ণের ক্ষেত্রে পরাজয়ের মধ্যেও প্রকট হয়েছে ব্যক্তি মানুষের মহিমা । কিন্তু কৃষ্ণ গণনাথ বা গণনাথ-অর্জুনের পরাজয় যেন শুধু সর্বস্বহারার পরাজয় নয়, এই পরাজয় একেবারেই মহিমাহীন । গণনাথ আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করল — হার মেনে নিল 'not with a bang, but a whimper'। 'বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ?'—তাই কি গণনাথের আত্মহত্যা ? বিশ্বাস নষ্ট হয়েছিল সূর্য-বুলনিদের সম্বন্ধে, না কি যমুনার সম্বন্ধে, যে যমুনাদের জন্যে সে মারামারি করেছিল ? লেখক যেন এই রকম একটা জবাব আশা করেছেন । কিন্তু আসলে মনে হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই গণনাথের এই আত্মহত্যা । ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের সামাজিক ভূমিকার অবসান ঘটে গেছে, তাই গণনাথের কোনো মহিমাময় ভূমিকা নেই ।"[৬]

উপন্যাসের প্রধান চার চরিত্র—সূর্য, বুলনি, অভয় এবং কৃপাময়কে খুঁটিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি তাদের যান্ত্রিকতা, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ভদ্রতা-বিচ্ছিন্ন রুক্ষতা, যৌনতা, —ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক অবক্ষয় ও অসুস্থতাকে

বয়ে বেড়িয়েছে। তাদের জ্বলন্ত মানসিকতা (যা হতে পারত জাগ্রত জীবনবোধের পরিপূরক) সম্পূর্ণই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে হতাশাঘন নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে। সমাজ তাদের দিকে সর্বদাই উপেক্ষা, অবজ্ঞার ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছে। সহানুভূতি এবং মমতা তাদের ভাগ্যে জোটে নি। এই বঞ্চনা যেমন আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে; তেমনিভাবে সমাজের দায়িত্বনিষ্ঠ মানুষদের তরফেও। পারিবারিক সম্পর্কের ভয়াবহ দিকটি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আমরা অনায়াসেই উল্লেখ করতে পারি সূর্য ও তার দিদি বিজয়াকে। বিজয়ার কুৎসিত আচরণ—তাদের পারস্পরিক ঘৃণা আর বিদ্বেষ মানবিক সম্পর্কের বন্ধন যে-ভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে — তা রীতিমত আতঙ্কের। বুল্‌লির সঙ্গে বৌদি মৃদুলার সংঘাত প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। অভয়ও তার বাবা-মায়ের ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয় এতটুকু কৃপাময়ের পারিবারিক বৃত্তান্তের মধ্যে শুধুই হতাশা এবং সুখহীনতা। সূর্যর বাবা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বুল্‌লির বাবা বড় দারোগাবাবু। কিন্তু তাদের অনৈতিক আচরণ ছেলেদের চোখে স্পষ্টতই ধরা পড়েছে। ফলত সংশোধন বা আশাপ্রদ কিছু নয়; বরং তাদের হতাশা—যন্ত্রণা হয়েছে ক্রমবিস্তারী। অভয়ের মধ্যে সবসময় হীনমন্যতার বোধ লক্ষ্য করা গেছে —যা তাকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে কৃপাময়ের গুমরে উঠে কান্না বড়ই মর্মস্পর্শী। গণনাথের প্রতি হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতা তাদের উপর আমাদের মনকে বিরূপ করে তুললেও আমাদের মনে রাখতে হবে সুস্থ জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেও এরা প্রত্যেকেই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিশাহারা। উপযুক্ত পরিবেশ ও আশ্রয়ের অভাব — সৎ চেতনার বিচ্যুতি তাদের টেনে নিয়ে গেছে অবক্ষয়ের পঙ্কিল আবিলতার মধ্যে; যদুবংশের ধ্বংসকাহিনীতে।

চরম অসুস্থতা, বিকৃত জীবনের বেদনা, সার্বিক হতাশার মধ্যেও আমরা এমন এক মানুষের পরিচয় উপন্যাসের মধ্যে পেয়েছি, — যে সব কিছু আবিলতাকে উপেক্ষা করে অনায়াসেই যেন বলে উঠতে পারে — "এ ভাবে নয়; মানুষের ভালবাসা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।" নিজেকে বঞ্চিত করেও সে নিবেদিত প্রাণ। এই নিবেদন মানুষের শুভ বুদ্ধির কাছে; সৎ চেতনার কাছে। ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়ে হয়তো গণনাথ বড় অসহায় এবং উৎপীড়িত। কিন্তু তাঁর

আত্মহত্যা কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়, চরম অসুস্থতার মধ্যেও তা আত্ম-নিবেদনেরই নামান্তর—যা নবজন্মের সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করেছে। এই মৃত্যু তাই ধ্বংসের ভগ্নস্তূপেও জয়ের পতাকা তুলে ধরে। গণনাথ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে বোধের পরিচয় সে রেখে যায় — তা অত সহজে শেষ হয় না।

একটি মানসিক চিকিৎসালয়কে কেন্দ্র করে রচিত 'দ্বীপ' (১৯৭৭) উপন্যাসে কিছু অসুস্থ – অসহায় মানুষের যে জীবন ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন; — তা একই সঙ্গে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।

'দ্বীপ'—এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ধারণাতে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতার যে ছবি ভেসে ওঠে, এই উপন্যাসটির মধ্যেও তা সুপরিস্ফুট। এখানে ঔপন্যাসিক মানবিক অসুস্থতার একটি বিশেষ স্তরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন —যা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিশ্লেষিত হয়েছে। একজন মানুষের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিহিত তা কখনও কখনও তাকে সামগ্রিকভাবেই অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শুধুমাত্র এই নিজস্ব বোধের পরিমণ্ডলেই নয়; কখনও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের টানাপোড়েনেও মনের মধ্যে ঘনীভূত হয় গভীর সঙ্কট -- যা ব্যক্তি-চরিত্রের আমূল পরিবর্তনই ঘটায় না, করে চরম অসুখীও।

গঠনশৈলীর দিক থেকে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট অভিনবত্বের দাবি রাখে। স্বল্পায়তন উপন্যাসটিতে ছ'জন পুরুষ এবং তিন জন নারী —মোট ন'টি চরিত্রকে প্রতিফলিত করা হয়েছে তাদেরই একজন ধ্রুবপদ মজুমদারের দৃষ্টি ও উক্তিতে। এই সব অসুস্থ চরিত্রগুলির অসুখের কথা বলতে গিয়ে তাদের অতীতকে টেনে আনা হয়েছে; — যেখানে একদিন সুখ, শান্তি, —কোনও কিছুর অভাব ছিল না, কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল, এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে গেল নিরুদ্বিগ্ন জীবনের যাবতীয় ভাবনা। উপন্যাসের যে ন'টি অসুস্থ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তারা হল, —বসুধা, সুনয়নী, ছোকনু, রাজু, রেবতী, নীপা, অলকা,

ফণী এবং ধ্রুবপদ । মানসিক চিকিৎসালয়ে এরা প্রত্যেকেই সমগোত্রীয় হিসাবে বিবেচিত হলেও এদের অসুস্থতার লক্ষণ বা প্রকৃতি কি-তু এক নয়, তবে কোনও না কোনও মারাত্মক আঘাত তাদের প্রত্যেককেই যে চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত করেছে এবং আচরণের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় অস্বাভাবিকতার জন্ম দিয়েছে -- সন্দেহ নাই ।

বসুধা হাসপাতালের অন্যতম রোগী । একদা তার জীবন ছিল অন্য পাঁচ-জনের মতই সরল ও স্বাভাবিক । আকস্মিকভাবেই তার ভাগ্যে দুর্ভাগ্যের মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করল । বাবা মারা যাওয়ার ফলে কলেজের পড়া শেষ না করেই কারখানায় একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হয়েছিল বসুধাকে । মা-ও মারা গেল অসুখে । ভাইটা ঝগড়া-ঝাটি করে কোথায় যে চলে গেল, আর বোন বিয়ে করার পরই দাদার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল । বসুধার অসুখ শুরু হয়েছিল তার আগে থেকেই। শিরদাঁড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা যায় না । ঘাড় মাথা যেন ছিঁড়ে যায় । কারখানার হাসপাতালে চিকিৎসার পর কলকাতায় এসে রে নিল । সেই থেকেই পিটের রঙ পালটে যেতে থাকল । চাকরি-বাকরি খুইয়ে বড় অসহায় হয়ে পড়েছিল বসুধা । আগেই সে বিয়ে করেছিল, এই সব নিয়েও অশান্তির আর শেষ রইল না । বসুধার অসুখটা শেষাবধি এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে আত্মহত্যার চেষ্টাও সে করেছিল । তারপর সকলে মিলে তাকে এই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল । এখানে বসুধাকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার ঠোঁট নড়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে । সে মেরুদন্ড বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কোনওরকমে হাঁটার চেষ্টা করে । খালি গায়ে থাকলে সাপের খোলসের মত মেরুদন্ডটা দেখে গা শিরশির করে ওঠে । বসুধা যখন স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকে, তখন তার পরিবর্তিত ভয়ঙ্কর অবস্থার কিছুই বোঝা যায় না ।

> বসুধার সেই চেহারা চোখে দেখা যায় না । আপনি কি কখনো দেখেছেন, একটা মানুষ একেবারে উলঙ্গ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে, পুঁটলির মতন ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, মাথা ঠুকছে, মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে, সেই গেঁজলা হাতে করে নিয়ে নিজের মুখে মাখাচ্ছে আর অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করছে ? তখন

ওর কাছে যাওয়া যায় না। সমস্ত গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়, পচা ঘাসের মতন এক গন্ধ। বসুধাকে মারুন ধরুন, গায়ে জল ঢেলে দিন—ওর হুঁশ ফিরবে না। সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে মাথা ঠুকবে আর গড়াগড়ি খাবে মাটিতে। এইভাবে ঘন্টাখানেক কি ঘন্টাদুয়েক চলবে—তারপর কাঁদতে শুরু করবে। সে কান্না আপনি কোনদিন শোনেন নি। শুনলে মনে হবে, মানুষ এমন করে কাঁদতে পারে না, কাঁদা সম্ভব নয়।

স্বামী, ছেলে-মেয়ে, টাকাকড়ি,—সব কিছু নিয়ে সুনয়নীর দাপটও একদিন কম ছিল না। তবুও কী যে হল—হঠাৎই শরীর খারাপ করল তার। বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসাও হয়েছিল, কিন্তু বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে অন্য এক ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ল সে। আর তার পর থেকে এই হাসপাতালে। সুনয়নীর অসুখের লক্ষণটা বড় অদ্ভুত। বাইরে থেকে সচরাচর বোঝা যায় না। মাসে একবার কি দু'বার সে পালটে যায়। স্বামী বেঁচে থাকলেও সে সর্বদা বিধবার বেশে থাকে। এই সময় সুনয়নী কিন্তু সেজে ওঠে সধবার সাজে। ঘরের মধ্যে থেকে চাপা স্বরে কথা বলে যায় সে; কখনও মনে হয় স্বামীর সঙ্গে, কখনও বা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে।

এইরকম চলতে চলতে হঠাৎ একসময়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ও। তখনই বাড়াবাড়ি। নিজের শরীরকে তখন সে আর রক্ত-মাংসের দেহ বলে মনে করে না, মনে করে তার সমস্তটা কাচ দিয়ে তৈরী। হাত পা নাড়ে না, তাকায় না। তার কাছে কারও যাবার উপায় নেই। ভাবে, ওকে ছোঁয়ামাত্র ও ভেঙে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে। নিজের শরীরকে কাচের তৈরী ভেবে ও এক-আধটা দিন কেমন করে পড়ে থাকে না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না। তার পর যখন ঘোর কাটে তখন আবার সেই পুরোনো মানুষ—এই সুনয়নী।

সুনয়নীর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে স্বামীর উপর তার বিতৃষ্ণা। ছেলে-মেয়েকে নিয়েও সে সন্তুষ্ট ছিল না।

'একটা ভালুকের মতন চেহারা, গায়ে এতো লোম। ভাঙ খাওয়া চোখ। সারাদিন শুধু টাকা টাকা করে ঘুরত। টাকায় পাওয়া সেই জন্তু রাত্তিরে বাড়ি এসে জপতপ করতে বসত, বুঝলে গো মজুমদারবাবু! বরের আমার জপতপে মতি ছিল। তারপর আসত তার ভালুক জ্বর ...ওই মানুষের ছেলেমেয়ে কেমন হবে গো? ছেলেটা হল ড্যালডেলে, কালো কুৎসিত। এতোখানি মাথা। ঘেন্না করে। ...ভাবলাম পরেরটা ভদ্দরলোকের ছানা হবে। ও মা, সেটাও হল কালিদী। ওই মেয়ের কি বিয়ে হয় মজুমদারবাবু? হয় না। তবু হল। কেমন করে হল তুমি তার ছাই জানো!

সুনয়নী একদিন অসাধারণ রূপসী ছিল। এখনও বোঝা যায়। কিন্তু সুনয়নীর এই ঘেন্না, তার হতাশা, যা শুধুমাত্র স্বামীর জন্যেই নয়: নিজের সন্তানের উপরও তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে,— তা কী একান্তই রূপজ অহঙ্কার? হয়তো সে যেমনটি চেয়েছিল —তার কিছুই পায় নি; তাই এই তৃপ্তিহীনতা, অসুখ।

ছোকনু বাচ্চা ছেলে। দেখে মনে হয় না যে তার কোনও রোগ থাকতে পারে। কিন্তু একটা সময় আসে—যখন ওর মাথায় ভূত চাপে। 'সেই সময় ও প্রচন্ড হিংস্র, অসভ্য, বেপরোয়া হয়ে ওঠে।' তখন রোগা ছেলেটাকে সামলানো দায়।

তখন ওর অসাধ্য কাজ নেই। ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাবে। অন্যের ঘরে গিয়ে যা খুশি ভাঙবে। হাসপাতালের মাঠে দাঁড়িয়ে ঢিল পাথর যা পাবে ছুঁড়ে মারবে। খারাপ খারাপ কথা বলবে। এত খারাপ নোঙরা সে সব ভাষা

যে শুনলে আপনার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করবে ।
কেমন করে ওইটুকু ছেলে এ-সব ভাষা শিখেছে আমি
জানি না । হাসপাতালের কোনো মেয়ে যদি এ-সময়
ওর সামনে গিয়ে পড়ে তবে রক্ষে নেই, লাথি মেরে
কামড়ে গালাগালি দিয়ে একশেষ করে দেবে । ওর
মুখ তখন একেবারে নীল, গলার নালি ফুলে মোটা
হয়ে যায়, পরনে প্যান্ট থাকে না, গায়ের চামড়া
আগুন ।

যতটুকু শোনা গেছে —তাতে বোঝা যায় ছোকনুর বাবা-মায়ের সম্পর্ক ছিল খুব বিচ্ছিরি ধরনের । জোচ্চর প্রকৃতির বাবার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই ঝগড়াঝাটি, গণ্ডগোল লেগে থাকত । শেষে তার বাবা একদিন কোথায় যেন পালিয়ে গেল । ছোকনুর মা ছেলে নিয়ে চলে এল বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ভগিনীপতির কাছে । তারা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই বসবাস করছিল । কিন্তু ছোকনু তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল বিশ্রী এক সমস্যা । হাসপাতালের মত ওখানেও সে মাঝে-মাঝেই বেপরোয়া হয়ে উঠত । অনেক শাসনেও তাকে বশ মানানো সম্ভব হয়নি । শেষমেশ এই হাসপাতালে মেসো তাকে জন্তুর মত বেঁধে ফেলে রেখে গেল ; এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলও সম্ভবত । হাসপাতালে এসে সে প্রথম-প্রথম কান্না জুড়ে দিত । মর্মভেদী সেই হাহাকার । তারপর ইনজেকশন, ওষুধ আর ঘেরা পাঁচিল— আস্তে আস্তে ছোকনুও একদিন সবকিছুর মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠল ।

রাজু বড়লোকের ছেলে । সেই বাড়ির সকলেই স্বাভাবিক একমাত্র রাজু ছাড়া । ছোটবেলা থেকেই তার মৃগী ধরনের রোগ ছিল । অনেক সময় ধরে অজ্ঞান হয়ে থাকত । অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও সারে নি । বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উপসর্গ জুড়ে গেল । শেষকালে রাজুর আশ্রয় হল এই হাসপাতালে । এখানের সবাই তার মধ্যে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছে : অজ্ঞান অবস্থায় সে অনর্গল কথা বলে যায় ।

ডিলিরিয়াম নয় । এলোমেলো কথা খুবই কম ।
গুছিয়ে পর পর কেমন কথা বলে যায় ।

যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে । ওর এই কথার ভেতর থেকেই এক একটা সাংঘাতিক কথা শোনা যায় । সে-সব প্রায় দৈববাণী বা বলতে পারেন ভবিষ্যৎবাণী । তার কিছু না কিছু দেখেছি মিলেও যায় ।

মনে হয় রাজুর এই ক্ষমতাটা বাড়িতেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল । ও নিশ্চয়ই এমন কিছু মন্তব্য করেছিল, — যার মধ্যে যথার্থতা ছিল । 'বাড়ির লোক এটা সহ্য করতে পারে নি । সত্য বেশির ভাগ সময়েই অপ্রিয় এবং অসহ্য হয় ।'

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ঝকঝকে চেহারার রেবতীকে হাসপাতালের সবাই শিল্পী বলত । ওর ঘরে গেলেই দেখা যাবে বিভিন্ন জায়গাতে ছবি এঁকে রেখেছে, কাঠকয়লায় বা কালিতে । কি-তু ছবিগুলো কী অদ্ভুত ।

ওর ঘরের দেওয়ালগুলোতে ভূত নাচছে,
মস্ত মস্ত সাপ চোখে চশমা পরে ফণা
তুলে আছে, পদ্মফুল ভেঙে গিয়ে ঘড়ির
ডায়ালের মতন খসে পড়ছে কাঁটা সমেত ;
গোটা চারেক টেলিগ্রাফের পোস্ট তারের
খাঁচা করে একটা মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে ।
এই রকম সব অদ্ভুত, বীভৎস ব্যাপার ।

রেবতীর বাবা ছিলেন গাইয়ে মানুষ । বাবা মানুষটি সারা জীবন শুধু গান গেয়েই গেলেন । সংসারের প্রতি কোনও দায়িত্বই তিনি অনুভব করেননি । কায়ক্লেশে চাকাটা গড়িয়ে যেত মাত্র । রেবতী বাঁকুড়াতেই কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল । ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকাতে তার উৎসাহ । বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আঘাতের পর আঘাত রেবতীকে দমিয়ে দিচ্ছিল । এক ভাই খুন-জখমে হাত পাকিয়ে ফেলেছিল ; অপর এক ভাই কাজ জুটিয়েছিল ইলেকট্রিকের দোকানে। জরা-জীর্ণ মায়েরও অসুখ পড়তে লাগল এক-এক করে । ইতিমধ্যে রেবতীর বোনও এখানে ওখানে চরা শুরু করে দিয়েছিল । এরপর সে পেল চরম আঘাত ।

রেবতীর আশ্রয় ছিল এক ব-ধু । তাকে কারা যেন
একদিন বাস থেকে নামিয়ে খুন করল । তারপর
থেকেই রেবতীর অসুখ । যখন তখন বমি করতে
শুরু করে । একবার শুরু করলে-সহজে আর থামে না।
বমি যদি বা থামল , ঘন ঘন মুখ ধোয়া আর হাত
ধোয়া শুরু হল । হাত ধুয়ে ঘরে এলো আবার চলন ।
রাত্রে ঘুমের মধ্যে হাঁটাচলা করে , অন্ধকার দেওয়ালে ছবি
আঁকে ।

নীপা এমন মিষ্টি করে কথা বলে আর সুন্দর করে হাসে যে ভাল না লেগে উপায় থাকে না । ওর কানের পাশ দিয়ে গলা বরাবর মস্ত একটা দাগ আছে । পোড়ার মত দেখতে হলেও তা নয় । শ্বেতী ধরনের কোনও রোগ হতে পারে । নীপার বাবা বেঁচে নেই । সংসার ছেড়ে ধর্ম-কর্ম করতে গিয়েছিলেন , মথুরাতেই তিনি মারা যান । তার মায়ের নাম কাগজ-পত্রে প্রায়ই দেখা যায় । উনি সমাজের সেবা করে বেড়ান । একদিনকার একটা ঘটনা নীপার সমস্ত জীবনটাই এলোমেলো করে দেয় । মথুরা থেকে নীপার মায়ের নামে একটা পার্সেল এসেছিল । নীপা জানত তার বাবা মথুরাতে মারা গেছেন । অনুচিত জেনেও শুধুমাত্র কৌতূহলের বশেই পার্সেলটা খুলেছিল। কোনও এক পরিচিত ব্যক্তি তার বাবার কয়েকটা জিনিস মায়ের নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন : 'পুরোনো চশমা , পকেট ঘড়ি , বাবার লেখা চটি চটি বই , একটা ময়লা ডায়েরী , বাবার ফাউনটেন পেন ।'

ওই ময়লা ডায়েরী পড়ে নীপা তার মা-বাবার
যে ইতিহাসটা জানতে পারল , সেটা ভাল নয় ।
দু'জনের সম্পর্ক এক সময় স্বামী-স্ত্রীর থাকলেও ,
সেটা সমাজসম্মত বা আইনসম্মত ছিল না ।
নীপার মা ছিল তার বাবার সম্পর্কে বউদি ।
দু'জনেই প্রায় সমবয়সী । পরস্পরের আকর্ষণে
তারা সংসারবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে । নীপার

জন্মানোর পর দু'জনেরই নানা কারণে অনুশোচনা দেখা দেয়, মানসিক বিরোধও। অশান্তি, বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এমনই বেড়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত নীপার বাবা সংসার ছেড়ে চলে যায়। অনুতাপ বলুন, প্রায়শ্চিত্ত বলুন, বা সেন্স অফ গিল্ট বলুন —দু'জনকে শুধু বিচ্ছিন্ন করে নি —দু'জনকেই যেন আত্মশুদ্ধির মধ্যে দুদিকে ঠেলে দিল। অবশ্য, শুনেছি নীপার মা ঠিক আত্ম-শুদ্ধির জন্যে সমাজসেবায় যায় নি, পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর খ্যাতি, প্রতিপত্তি তাকেও ধীরে ধীরে উঁচু জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। ওটা শুদ্ধি নয় বুদ্ধি। প্রতিপত্তি ও যশ কেনার বুদ্ধি।

প্রথম কয়েকদিন পার্সেনটার কথা কাউকে বলেনি। শুধু ছটফট করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারপর থেকেই নীপার অসুখ।

এই অসুখটা বড় বিচিত্র। ওর সুখ দুঃখের বোধগুলো কেমন পালটে গেছে। আমরা যখন হাসি ও কাঁদে; আমরা যখন দুঃখ পাই ও হাসে। একদিন ওর পা কেটে গিয়েছিল কাচে, গলগল করে রক্ত পড়ছে, সুনয়নী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে — অথচ নীপা হাসছে খিলখিল করে। আশ্চর্য কাণ্ড। অনেক সময় আমরা শারীরিক কষ্ট পাই — যেমন ধরুন হাত পা মাথায় চোট পেয়েছি, জখম হয়েছি — নীপাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। সে যেন মজা পেয়ে হেসেছে। আবার আমাদের কাছে যা হাসি তামাশার ব্যাপার— ওর মশাই তাতেই মুখ ভার, চোখে জল।

কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি, নীপার মধ্যে একটা চাপা ব্যাপার আছে। তখন ও

শরীর নিয়ে খেলা করতে না পারলে পাগলের
মতন কাণ্ডকারখানা করে । হয়ত সেটা নিজের
প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা । হয়ত তার মা-বাবার
ওপর কোনো বিদ্বেষ ।

বছর তিরিশ বয়সের অনকার জীবন একদিন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই এগিয়ে চলেছিল । সুখ-সোহাগের ঘাটতি ছিল না এতটুকু । কিন্তু বাদ সাধল ভাগ্য । স্বামীর কি একটা অসুখ ছিল, সেই অসুখে সহসাই মারা গেল সে ।

স্বামীর মৃত্যুর পর অনকা পুরোপুরি পাগলের মতন
হয়ে ওঠে । প্রথম দিকে ওর মধ্যে যা দেখা দেয়
সেটা ছিল হিংস্রতা । বাড়িতে রাখা যেত না ।
ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে কোথাও পাঠানো হয়েছিল ।
তারাও রাখতে পারল না । আবার বাড়ি । কিন্তু
একারে একেবারে নির্জীব, জড় যেন । কথা বলে
জড়িয়ে জড়িয়ে, মোটা গলায়, চোখের দৃষ্টি
ঘোলাটে, বসে থাকে তো বসেই থাকে, কাঁদে তো
অবিরল কেঁদে যায় । চাপা কান্না । গরু-বাছুরের মতন
ব্যবহার । এরই মধ্যে নতুন উপসর্গ জুটল । সন্দেহ ।
সব সময় ভাবে—দেওর তাকে বিষ দিচ্ছে । কোনো
উপায় না দেখে দেওর ওকে এই হাসপাতালে পাঠাল ।

রীতিমতন কষ্ট করে ফণী যখন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিল, সেই সময়েই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল তাকে । প্রথমে স্কুল মাস্টারি করত । পরে কলেজের চাকরি জুটিয়ে ফেলেছিল । দিদি কাজ করত নার্সিংএর । অনেক মেহনতের পর সংসারটার হাল যখন আস্তে আস্তে ফেরার মুখে সেই সময়েই ফণী একটা মারাত্মক গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে । কলেজে আসার পথে একজন ছাত্রকে রক্তাক্ত পড়ে থাকতে দেখে ফণী তাকে রিকশা ডেকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল । এটাই তার মারাত্মক অপরাধ যে ছেলেটা কোনওক্রমেই বাঁচতে পারে না, ফণী তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে?

দুঃসাহস কম নয়; উড়ো চিঠি, শাসানি, কোনো কিছুই আর বাদ রইল না। কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ফণীর। এই রকম সময়েই তার দিদিকে ধাপ্পা মেরে এমন একজন বিয়ে করল যার স্ত্রী বর্তমান।

> দুদিকের টানাপোড়েনে ফণীর অসুখ করল। নানা রকম ভয় পেতে লাগল ফণী। অদ্ভুত অদ্ভুত ভয়। কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না। বাড়ির বাইরে বেরুত না, মাথার ওপর পাখা ঝুলোতে দিত না। সব সময় তার মনে হত মাথার ওপর পাখা ভেঙে পড়বে, পুরোনো বাড়ির ছাদ ধ্বসে যাবে, দেওয়াল ফেটে যাবে। যার সঙ্গে কথা বলত না, দিদিকে বাড়ি ঢুকতে দেখলে চেঁচাত। প্রথম দিকের এই ধাক্কাটা কেটে যাবার পর ফণী আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে রাতারাতি ধর্ম নিয়ে পড়ল। ধর্ম-টর্মও গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে ফণী কলকাতার খারাপ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে করতে বার দুই অসুখে পড়ল। তারপর এখানে।

ফণীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার মুখ থেকে প্রায়শই বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কথা শোনা যাবে। কখনও তার দিদির কথা, কখনও স্ত্রী, কখনও আবার ছেলেমেয়ের গল্প। কিছুটা সত্যি হতে পারে, বেশির ভাগই একেবারে বানানো। আসলে ফণী মনে মনে একেবারে নিঃসঙ্গ। কাল্পনিক আত্মীয়তা, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা,— প্রভৃতির মাধ্যমে সে হয়তো সামাজিক দায়-দায়িত্বকে বহন করার ইচ্ছা পোষণ করে, সুখ ও তৃপ্তির সন্ধানে আকুল হয়; যদিও দুঃসহ নিঃসঙ্গতার কবল থেকে এতটুকুও রেহাই মেলে না।

হাসপাতালের সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান মানুষ ধ্রুবপদ মজুমদার। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। যা নাই তা অনুভব করাই হল এই অসুস্থ মানুষটির বৈশিষ্ট্য। সে অলীক প্রত্যক্ষ করে, ভয়ের ঘটনা, — যা ঘটেনি তা। ধ্রুবপদর বাবা মনে করতেন বেঁচে থাকা আর

অস্তিত্ব বজায় রাখা —এই দুটি ব্যাপার এক নয়। তাঁর মাথাতে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর ধ্রুবপদ একদিন ঘুম থেকে উঠে বিছানার পাশে মরা বেরাল বাচ্চা পড়ে থাকতে দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায়। তার মনে হয়েছিল বাবাই বুঝি ওটাকে ওখানে ফেলে গেছেন। ছেলেবেলার পর্বটা এই রকম আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে তার। প্রায়শই তার মনে হত অদৃশ্য থেকে বাবা তাকে লক্ষ্য করে চলেছেন। লেখাপড়া শেষ করার পর সে ব্রিটিশ ফার্মে চাকরি নিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ এগিয়ে গেল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেলে মানুষের ঝোঁক আসে ভোগ-সুখের দিকে। ধ্রুবপদও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই সময়ের এক বন্ধু প্রণবেশকে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, প্রণবেশ টি বি রোগী, কিন্তু কী আশ্চর্য!— বেপরোয়া জীবনের প্রতি আকর্ষণে এতটুকু ঘাটতি ছিল না তার। প্রণবেশের স্ত্রী শোভা স্বামীকে কিছু বলত না। সে জানত কী ঘটতে পারে। প্রণবেশ মারা গেল। ধ্রুবপদ শোভার কাছে আসা-যাওয়া করত। একদিন শোভার পাশে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ-ই তার মনে হল একটা মরা বেরাল ছানা পড়ে আছে সেখানে। শোভার কাছে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ধ্রুবপদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেতে উঠল ব্যবসা নিয়ে। উপার্জন মন্দ ছিল না। তা সত্ত্বেও ধ্রুবপদর মনে হচ্ছিল —সে সুখী নয়। অবসাদ আর ক্লান্তিতে সমস্ত মন ডুবে যেতে চাইত। ধ্রুবপদর অনুভবের মধ্যে এই হতাশার ছবিটি খুবই স্পষ্ট :

> কুয়োয় পড়ে যাওয়া বালতি তুলতে দেখেছেন কখনো? কাঁটা দিয়ে তুলতে হয়। মাঝে মাঝে যখন আমি অবসাদ, ক্লান্তি, ভাল-না-লাগার কুয়োয় পড়ে যেতাম তখন আর অন্ধকার এবং নিঃসঙ্গতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কাঁটা বেঁধে ওপরে তুলে আনতাম। এই কাঁটাগুলো কী আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মদ্যপান, বন্ধু-সঙ্গ, কিছু জুয়ো খেলা, কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা। কিন্তু কাঁটায় তোলা বালতি আবার ডুবে যেত যে কোনো দিন।

কিছুদিন পরে ধ্রুবপদ বিয়ে করে ফেলল । কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েক বছর পরেই আবার সেই নৈরাশ্য । স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে আত্মিক সংযোগের তাগিদ কখনও অনুভব করেনি । সকল সময়েই মনের মধ্যে জেগে থাকত বিচ্ছিন্নতার বোধ । ধ্রুবপদর মনে হত সেও তার বাবার মতন হয়ে যাচ্ছে । স্ত্রী-সন্তান-ব্যবসা-টাকাকড়ি কোনও কিছুতেই সে আর উৎসাহিত হচ্ছিল না । একদিন মাঝরাতে ধ্রুবর মনে হল একটা মরা বেরাল বাচ্চা পড়ে আছে । শোভার পাশে শুয়ে সেটা দেখার মধ্যে একটা যুক্তি-সিদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও যেতে পারে ; কিন্তু বিনতা তো পরস্ত্রী নয় , — সে ক্ষেত্রে এই রকম অলীক দর্শনের কী কারণ থাকতে পারে ? ক্রমশ ধ্রুবপদর চোখের সামনে নানারকম ভয়ের দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল । মনে হত কেউ যেন ট্রামে কাটা পড়ল , হয়তো বা মেয়ে ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছে , কখনও আবার দুটো গাড়ি মুখোমুখি ধাক্কা খাচ্ছে । ডাক্তার দেখানো হল । ওষুধও খাওয়া হল বিস্তর । কিন্তু সবটাই যে বৃথা — ধ্রুবপদ নিজে থেকেই সেটা বুঝতে পেরেছিল ।

> আমি বুঝতে পারছিলাম , এ-সবই বৃথা ।
> বৃথা কেননা আমি এই বাঁচার মধ্যে কোনো
> সুখ , তৃপ্তি কিংবা সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না।
> সেই পুরোনো , সেই সহজ অথচ বেয়াড়া প্রশ্নটা
> আমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে । কেন আমি বেঁচে
> থাকব ? কোন আশায় ?

ধ্রুবপদর ভুল ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল । বেড়ে চলেছিল তার আভ্যন্তরীণ শূন্যতাও । স্ত্রী-সন্তান-আত্মীয়-সমাজ সকলের কাছেই সে তখন প্রয়োজনহীন এবং বাতিলের পর্যায়ে । সেই থেকেই সে এই হাসপাতালে ।

উপন্যাসভুক্ত ন'জন মানসিক রোগীর অতীত এবং বর্তমান আলোচনা করতে গিয়ে আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি কোনও না কোনও দিক থেকে এক রকম আঘাত তাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে দিয়েছে । আমরা জানি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই

রয়েছে সমগোত্রীয় অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রবল চেতনা অবশ্য এই ইচ্ছাকে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাহত করতে পারে; এবং ধ্রুবপদর মধ্যেও (যা অনেকাংশেই ঐতিহ্যগত) সেই নিদর্শন আমরা পেয়েছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অন্যরকম কিছু। জীবনের মধ্যে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত থেকেও বসুধা, সুনয়নী, রেবতী, নীপা, অলকা, ফণী, ছোকনু যেভাবে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, নির্বাসিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই ব্যক্তি এবং সমাজ আশ্রয়ী পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূল স্রোতই তাদের মনের মধ্যে সঞ্চার করেছিল চরম অতৃপ্তি, গভীরতর অ-সুখ। ফলত তারা স্বাভাবিক পদচারণার ক্ষেত্রভূমিতে স্তব্ধ-গতি; যাবতীয় চাঞ্চল্য থেকে উৎসাহহীন। অসুস্থাবস্থায় চরিত্রগুলির আচরণে অলীক দর্শন, অদ্ভুত ভয়, সন্দেহ, অস্বাভাবিক কান্না, ভঙ্গুরতার বোধ, বীভৎসতার প্রতি ঝোঁক—প্রভৃতির মাধ্যমে বোঝা যায় অ-সুখের যন্ত্রণা কত মারাত্মক।

ন'টি চরিত্রের অন্যতম – রাজু। তার ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতার দাবিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। (অন্তত অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায়) রাজুকে হাসপাতালে পাঠানোর কারণ হিসাবে লেখকের চূড়ান্ত কথা – 'সত্য বেশীর ভাগ সময়েই অপ্রিয় এবং অসহ্য হয়'—নিঃসংশয়িত ভাবেই সত্য। কিন্তু অপরাপর চরিত্রগুলি অপেক্ষা রাজুর নিষ্প্রভ হওয়ার কারণ অলৌকিকত্বের প্রতি অনাবশ্যক ঝোঁক; মনস্তাত্ত্বিক প্রকরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

উপন্যাসের মধ্যে ধ্রুবপদর কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত। আত্মিক সঙ্কটের এমন উদাহরণ প্রকৃতই অসাধারণ। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সে যেভাবে ক্লান্তি বোধ করেছে, নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে উঠেছে—তার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নাই। বেঁচে থাকার চেষ্টা ও অস্তিত্ব বজায় রাখার বোধ—এই ব্যাপার দুটি যে সমার্থক নয়; সেটা বাবার মত ধ্রুবপদর উপলব্ধিতেও ধরা পড়েছিল। সে স্ত্রী-সন্তান—কোনও কিছুর সঙ্গে নিজস্ব সত্তাকে যুক্ত করতে পারেনি। এটা তার ব্যর্থতা নয়; বরং বলা ভাল—উপলব্ধির দায়।

উল্লিখিত ন'টি চরিত্র ছাড়াও আরও একজনের কথা বিশেষ ভাবেই প্রাসঙ্গিক।

ডা: দাশগুপ্ত । তার জঘন্য কীর্তিকলাপ উপন্যাসে ধরা রয়েছে ।সে অসহায় অচেতন অনেককে বিবসনা করে কাম পরিতৃপ্তির চেষ্টা করেছিল ; রমকই যখন ভক্ষক হয়ে উঠে—তখন তার মত ঘৃণ্য আর কে থাকতে পারে ? কি-তু অন্য দিক থেকেও তাকে বিচার করার দরকার আছে । এ-প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ওই মানুষটিও অসুস্থ ।

> দাশগুপ্তর সমস্তই খারাপ , কি-তু ওর দিক দিয়ে
> ভেবে দেখলে আবার দুঃখই হবে । একটা সবল সুস্থ
> মানুষ বছরের পর বছর এখানে পড়ে আছে আমাদের
> মতন কিছু রোগী নিয়ে । লোকটার ঘর সংসার ,
> ছেলেপুলে , ব-ধুবা-ধব , আহ্লাদ বলে কিছু নেই ।
> সীতারামের আনা মদ খায় , একটা মেয়েছেলেকে
> নিতা-ত অভ্যাসের মতন ব্যবহার করে , আর শুনেছি—
> কখনো কখনো অনেক রাত পর্যন্ত এই মাঠে একা একা
> ঘুরে বেড়ায় মাতাল অবস্থায় । দাশগুপ্ত বলে —
> একদিন সেও নাকি এই হাসপাতালের কোনো একটা
> ঘরে জায়গা করে নেবে

বস্তুতই এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র রোগী-ই নয় , চিকিৎসকও বড় অসহায় । বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নির্জন এক দ্বীপে এই ভাবেই ভাগ্যাহত কয়েকটি মানুষ দিন গুণে চলে—চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকে ।

ছোট এই জীবন । এরই ছোট পরিসরের ভিতরে আমরা সাজিয়ে তুলতে চাই আমাদের ঘর-সংসার , এবং আরও কত কিছু । প্রয়াসের মধ্যে আড়ম্বরের আতিশয্য নাই থাকুক --আ-তরিকতার ঘাটতি থাকে না বি-দুমাত্র । একটা ছোট সুন্দর বাড়ি , রম্য পরিবেশ , মমতা মোড়া সংসার , স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে—সবাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার যে

পরিপূর্ণতা তার মতন সুখ আর কোথায় ? উদ্বেগে উদ্বেল মধ্যবিত্ত জীবনের এই যে স্বপ্ন —তার মূল্য অনেক । তবুও হঠাৎই স্বপ্নের রেশটুকু ঘুচে যায় ; তিল-তিল করে গড়ে তোলা বাড়িটা সহসাই ভেঙে পড়ে হুড়মুড় করে । আসলে মনের ভিতরেই যদি ঘুন ধরে যায় তাহলে সবকিছু এমনিভাবেই চুরমার হয়ে যায় , —'হৃদয়তল' (১৯৮৭) উপন্যাসটির মধ্যে উপন্যাসকার এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । উপন্যাস-কারের এই মনোভাবের অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রৌঢ় গৃহকর্তা রজনীকান্তর উপলব্ধিতে :

> সুখ শান্তি ইট কাঠ দরজা জানলার
> সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না । থাকে
> মানুষকে জড়িয়ে ।

প্রৌঢ় গৃহকর্তার অনেক যত্ন আর পরিশ্রম করে গড়ে তোলা বাড়িটি তার আশ্রয় , আত্মমর্যাদা , গৃহসুখ , সন্তানদের প্রতি মমতা—এই সব কিছুর চিহ্ন । কিন্তু সবই অর্থহীন হয়ে ওঠে যখন মনের সুখ আর শান্তি অদৃশ্য হয়ে যায় । একই সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে আর একটি সমস্যাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে । সেটি হল , —বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েদের শুধুই কী নেওয়ার পালা , বাবা-মা কি তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারেন না কিছুই ? বাবা-মায়ের যখন দেওয়ার মতন কিছু থাকে না , তখন তাঁদের বাতিল বলে গণ্য করা হয় ; এমনকী প্রশ্ন তোলা হয় অভিভাবকত্বের সীমারেখা নিয়েও । শুধু তাই নয় , —তাঁদের আত্মতা থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টাও শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই । জীবনের সীমান্ত-বেলায় পৌঁছে যাওয়া প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার প্রতি এই ধরনের আচরণ মানবিক সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতাকেই নির্দেশ করতে চেয়েছে ।

কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাই রজনীকান্ত এবং প্রতিভা অনেক যত্ন করে তাঁদের সংসার গড়ে তুলেছিলেন । তাঁরা চেয়েছিলেন সীতেশ-অতীশ প্রতিষ্ঠিত হোক । সুখে ঘর-সংসার করুক মণিকা । কষ্ট করে তৈরি করা নতুন বাড়িতে কিন্তু শান্তি স্থায়ী হয়নি । অদৃশ্য হয়েছে সুখ । স্বামীর ঘর করতে গিয়েও বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে মণিকা । সীতেশের ঔদ্ধত্য , দুর্বিনীত আচরণ আর

আত্মম্ভরিতা সংসারকে পরিণত করেছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে । সন্তানের কাছে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা কত ব্যাপক ! অথচ বড়ছেলে সীতেশ যেভাবে রজনীকান্ত ও প্রতিভাকে যন্ত্রণাদীর্ণ করেছে তাতে শিউরে উঠতে হয় । সুখের সন্ধানে ব্যাকুল হয়েও তাঁরা সুখ পাননি ; বরং প্রচন্ড আঘাতে এই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বিমূঢ় -বিধ্বস্ত । উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে —ধীরাজের কাছে মণিকা আশ্বাস খুঁজে পেতে চেয়েছে , অতীশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্যণীয়ও । অনেক দুঃখের ভিতরেও এই যে নৈকট্যের নিবিড়তা , — তাও বুঝি একটু সুখের জন্যেই ।

রিটায়ার করার পরে রজনীকান্ত ব্যানার্জী সাহেবের অফিসে যান ; টুকটাক কাজ করেন তিনি ওখানে । ওখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । ধীরাজ তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে । ধীরাজের মনে হয়েছে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর শরীর ও মনের ওপর খুবই চাপ পড়ে ।

> " ভাল । এটা খুব ভাল ।" ধীরাজ বলল ,
> "রিটায়ার করে ধপ্ করে বসে যাওয়া ভাল
> না । তাতে ফিজিক্যালি যত না ক্ষতি হয় তার
> চেয়ে বেশি হয় মেন্টালি । গাড়িতে আসার সময়
> উনি বলছিলেন , ব্যানার্জি সাহেবের অফিসে উনি
> যান মনটাকে ভাল রাখতে । কাজকর্মের মধ্যে
> থাকলে মনটন ভাল থাকে ।

প্রতিভা রজনীকান্তকে ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়ার জন্যে তাড়া দিয়েছেন । শরীর নিয়ে কোনও রকম ঢিলেমি তাঁর অসহ্য । অতীশ তার মা-বাবার কথা-বার্তা শুনেছে , শুনতে পেয়েছে তাঁদের আক্ষেপও ।

> "তুমি এত তাড়া মারছ কেন ? "
> "আমার স্বার্থে । ....বাড়ি বাড়ি
> করে নেচে তো এই করলে ? টাকা
> গেল , পুঁজি গেল , শরীর গেল —
> এখন তো ওপরের দয়ায় আছি ।

তুমি কী চাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে
বসি কাঁদি ?"

একটু চুপচাপ। বাবা বলল,
"কাঁদতে হবে না। ছেলে মেয়েরা তো
থাকল। না হয় বুড়োই থাকবে না।"
"থামো। নাটুকে কথা। ছেলেমেয়ে
থাকল ... ছেলে তো ওই পদের সব।
আর মেয়ের কথা বলো না। গলায়
ঝুলে রইলো আমার। মরার দিন পর্যন্ত
থাকবে। তুমি ভেব না মেয়ের আবার একটা
জুটবে কিছু। একবারই জুটেছিল।
কপাল ভেঙেছে। এখন ওইভাবেই থাকুক।"

প্রতিভার কথাতে যন্ত্রণার আভাস। অনেক কষ্ট করেই মণিকার বিয়ে দিয়েছিলেন রজনীকান্ত। বিয়ের পর যথারীতি স্বামীর ঘরও করতে গেল সে। কিন্তু কিছু দিন পরেই মণিকা বুঝতে পারল তার পক্ষে ওখানে থাকা অসম্ভব। তার শাশুড়ি আর ননদ আচারে-ব্যবহারে ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। পতিদেবতাটিও রীতিমতন অমানুষ।

তবু, মা যার মেয়ের ব্যাপার নিয়ে
সে হয়ত অতটা চিন্তিত, অধৈর্য হয়ে
উঠত না অমন তাড়াতাড়ি —যদি দেখত
স্বামী লোকটা মানুষ। সে আরেক
অমানুষ। তার সৎ মা আর দিদির পোষা
কুকুর। ওরা যা বলছে, যেমন বলছে,
হুকুম করছে যেমনটি—এই মানুষটা তাই
করছে। নিজের কিছু নেই, ব্যক্তিত্ব, পছন্দ,
ভাল-মন্দ বোধ, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান।

* * * * * *

মণিকা স্বামীর চোখে আঙুল দিয়েও দেখাতে
পারেনি—তার শাশুড়ি আর ননদ কত নোংরা,
বিষয়গ্রস্ত। বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই
রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি চেঁচামেচি শুরু হয়ে
গিয়েছিল।

* * * * * *

এক গ্রীষ্মে, বৈশাখে বিয়ে হয়েছিল মণিকার।
পরের বছর বর্ষায় সে স্বামীর সংসার পাকা-
পাকিভাবে ছেড়ে চলে এল।

প্রতিভার ইচ্ছা —সীতেশের সঙ্গে চারুদির মেয়ে ঝুলনের বিয়ে হোক; তিনি অনেকটা এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু সীতেশ এ ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নয়। তার নজর অন্য দিকে। মণিকার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে এটা ভালভাবেই পরিষ্কার হয়েছে।

"তোকে সত্যি কথা বলব ?" সীতেশ
আচমকা বলল। মণিকা যেন অবাক
হল। ভাইকে দেখছিল। "বল।"
"এ-সব ব্যাপারে আমি কোনো কথা
দিতে চাই না।"
"কথা তো মা-বাবা দেবে।"
"কী বলছিস তুই। বিয়ে করব আমি।
কথার দায়িত্ব আমার। মা বাবার কথা
দেওয়ার মধ্যে কোনো রেসপন্সিবিলিটি
নেই। ওটা গার্জেনশিপ। ফ্যামিলি প্রেস্টিজ।
মা-বাবার কী আসে-যায় রে। ভুগতে
হবে আমায়।"

মণিকা ভাইকে একদৃষ্টে দেখছিল । সীতু
বোধহয় সাংসারিক বোধ-বুদ্ধিতে পাকা হয়ে গিয়েছে ।
সে জানে, বিয়েটা তার জন্যে, তার মা-বাবার
জন্যে নয় । জীবনকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে চায়
না সীতু ।

সীতেশের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকতেই পারে । কি-তু সে যে-ভাবে মা-বাবাকে সমালোচনা করেছে তা বি-দুমান সমর্থনযোগ্য হতে পারে না । সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের গভীর স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক, —এবং এই প্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে সীতেশ যতই তার যুক্তিতে নিপাট থাকার চেষ্টা করুক না কেন, মানসিক দৈন্য তাতে গোপন থাকেনি ।

ধীরাজ রজনীকান্তদের বাড়িতে প্রায়ই আসে, ওখানে সে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে । পছন্দ হওয়ার মতই লোক সে । একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে নিজের কথা বলে । তাদের পরিবারে একটা বংশানুক্রমিক রোগ আছে; সকলেই অকালে মারা যায় । ধীরাজ কি-তু এই রকম পরিস্থিতিতেও বিচলিত নয় । রজনীকান্তর সঙ্গে কথা বলার সময় ধীরাজের অবিচলিত ভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে আকর্ষক ।

ধীরাজ বলল, "আপনার তবু বয়েস হয়েছে,
শরীর ট্রাবল দিতে পারে । আমার এই বয়েসেই
হার্টে গোলমাল । আমার ঠাকুরদা, বাবা এরা
কেউ চল্লিশের ওপারে যায়নি । দাদা মারা গিয়েছে
একুশ বছর বয়সে । আমার পরিবারে কী যে
একটা অদ্ভুত রোগ আছে হার্টের — হেরিডেটরি—
সবাই প্রায় একইভাবে মারা যায় । হঠাৎ ।
আমিও যাব । দাদার একুশ বছরের হার্ডলটা
পেরিয়েছি । বাবা ঠাকুরদার চল্লিশটা বোধহয়
পারব না । .....দেখা যাক । তা বলে আমি
বসে থাকব না । না স্যার পারব না ।.....

আমি সারাদিন খাটি । মানে, কাজের সময়টা বসে থাকি না । বসে থাকলেই মরব । ডিপ্রেসান থেকে মেলান্‌কোলিয়ায় ধরবে । হয় পাগল হয়ে যাব, না হয় সুইসাইড করতে হবে ।" ধীরাজ হাল্কা শব্দ করে হাসে ।

উপন্যাসে লতিকার প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গেই একটি তেজী মেয়ের ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে । লতিকারা এক সময় সুখের মধ্যেই ছিল ; আপাতত সেই জগৎ থেকে নির্বাসিত সে । জীবনটা তার কাছে এই মুহূর্তে লড়াই-এর জায়গা ছাড়া অন্য কিছু নয় । এ-লড়াই বিশাল পৃথিবীতে নিজস্ব উপস্থিতিটুকু জানান্ দেওয়ার জন্যেই ।

কার জীবন কোথা দিয়ে কোথায় এসে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারে না । লতিকা সাধারণ মেয়ে । তা বলে একেবারে দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে ছিল না । তার বাবা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করতেন । স্বভাবে হাত-খোলা । খানিকটা নেশাভাঙের অভ্যেস ছিল । ভদ্রলোক কোথায় কী করেছিলেন কেউ জানে না ; শত্রু জুটে গিয়েছিল খারাপ ধরনের । লতিকার ভাই —যমজ ভাইকে মতিঝিলের দিকে নিয়ে গিয়ে কারা খুন করে । তখন থেকে ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে যান । মারাও যান দু'তিন বছর পরে । এই জমি এবং বাড়ি লতিকার বাবার । হাত দিয়েছিলেন । হয়ত ভাগ্যে সয়নি । শুরু হবার পরই ছেলে গেল । তারপর তিনি নিজে । এখন থাকার মধ্যে লতিকারা দুজন, লতিকা আর তার মা । মাকে আজকাল স্বাভাবিক বলা যায় না । অপটু, রুগ্ণ শরীর ; চোখে ভাল দেখতে পান না । লতিকার ওপরই নির্ভর ।

মণিকার শরীরে প্রায়ই অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় । নিজেকে তখন সে আর সামলাতে পারে না । একদিন ধীরাজের সামনেই সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে । ধীরাজ কারণ জিজ্ঞাসা করলে মণিকার মনে যে দৃশ্য ভেসে উঠেছে — তার মধ্যে কদর্যতার আভাস স্পষ্ট ; মণিকা সেই অসভ্যতা বরদাস্ত করতে পারেনি , কি-ন্তু মূল্যও তাকে দিতে হয়েছে ।

"কখনো লেগেছিল ? পড়ে গিয়েছিলেন ? হাড় চোট ?"

"না— "মণিকা মাথা নাড়তে নাড়তে আচমকা মনে করতে পারল , সে একবার বিশ্রীভাবে পড়ে গিয়েছিল । পড়ে যাবার ঘটনাটা এত কদর্য যে মনে পড়লেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে । বিয়ের দু তিন মাস পরের ঘটনা । সেই লোকটা মাঝরাতে , মণিকার ঘুমের মধ্যে তার শাড়ি জামা ছিঁড়ে ফেলছিল । ঘরের জানলা খোলা । ঘুম ভাঙতেই মণিকা যেন আঁতকে উঠে বিছানায় বসল । লোকটা তখন কুকুরের মতন দাঁত বের করে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে বসন । মাংসের দোকানে কুকুরগুলো যেমন দাঁত বার করে হাড় চর্বি কামড়াকামড়ি করে — একেবারে সেই রকম দেখাচ্ছিল তাকে ।

মণিকা ধাক্কা মারল লোকটাকে । লোকটা পড়তে পড়তে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে মণিকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । তারপর হাত পা নাড়ি ঘুঁষি — । খাট থেকে পড়ে গেল মণিকা । তার লেগেছিল ভীষণ । বুকের হাড় ভেঙে গেল ।

ধীরাজের সামনে কুণ্ঠিত মণিকা শুধু জানিয়েছে —বুকে আঘাত পেয়েছিল সে । ধীরাজ বলে , —

"হাড় ভেঙেছিল ? বুকের হাড় খুব নরম ।
সামান্য বেকায়দায় ভেঙে যায় । আবার
জুড়েও যায় ।"

—বস্তুত ধীরাজের মুখেই এমন দরদ-ভরা গভীর কথা মানায়। ধীরাজের আচরণ, সহমর্মিতা আমাদের মনে তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করেছে। এই স্নিগ্ধ স্বভাবের যুবকটি কখনই ভেঙে ফেলার নির্মম দানব নয়; সে যে নির্মাণের পবিত্র কারিগর!

রজনীকান্ত এবং প্রতিভা অনেক যত্নে —অনেক পরিশ্রমে তাঁদের সংসারটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিরাট কিছু আশা তাঁদের মনে ছিল না। রজনীকান্ত বে-হিসাবী ছিলেন না, প্রতিভাও সমস্ত দিকেই তাঁকে যোগ্য সহায়তা দিয়ে এসেছেন। অনেক সখ-স্বপ্ন বুকের মধ্যে জমা হয়ে থাকা সত্ত্বেও অনেক হিসাবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

> এত সত্ত্বেও তো কিছু কিছু গোলমাল হয়ে গেল
> সংসারে। কত আর মেলানো যায় জীবনে!
> তবে অন্যগুলো ছোটোখাট আঁচড়, বা কাটা-
> কুটি, যা শুকিয়ে যায় নিজেই, হয়ত দাগ
> রেখে যায়। মণির বিয়ে, বিয়ে ভাঙা তেমন
> আলগা আঁচড় নয়। এ-যেন শরীরের কোনো
> একটা অঙ্গ কেটেকুটে বাদ দিয়ে দেওয়া। বড়
> গভীর তার আঘাত। সেই ক্ষত ওপর ওপর
> শুকনো, কিন্তু ভেতরে বেদনায় ভরা।

শুধুমাত্র মণিকার জীবনের মর্মান্তিক ঘটনাই নয়, সীতেশের আচরণও তাঁদের ক্রমশ হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সীতেশ সংসারের বড় ছেলে হলে কি হবে, — বিন্দুমাত্রও দায়িত্ব সচেতন নয়। সে নিজেকে নিয়েই সদা ব্যস্ত। বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের নামে তার ভাব-সাব প্রতিভাকে গভীরভাবেই ব্যথিত করেছে। সীতেশ নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে সংসারটার কী শোচনীয় হাল, কেমন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে; —সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু তেমন ভাবে টাকা-পয়সা দেয় না। দ্রুত পালটে যাচ্ছিল সীতেশ। মণিকা আগেই একদিন সীতেশের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিল। সে-দিন মিনিবাসে বসে থাকার সময় দু'তিন জন বন্ধুর সঙ্গে সীতুকে সে টান খেতে দেখল। বুঝতে কোনও অসুবিধা ছিল না যে, ওরা নেশা করেছে।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল মণিকা। সৌভেশের অস্বাভাবিক আচরণে যন্ত্রণার্ত ও বিস্মিত অতীশও। নন্দিকার কাছে সে নিজেকে চেপে রাখতে পারেনি; জানিয়েছে — সারা বাড়িটাতেই সৌভেশের জন্যে নেমে এসেছে অশান্তির ছায়া।

"বাড়িতে যা চলছে এখন। রেগুলার অশান্তি। মা ফায়ার, বাবা নার্ভাস। দাদা বেপরোয়া। ভীষণ টেনসান। তার ওপর দাদা....."

নন্দিকা অতীশের মুখে দেখছিল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল অতীশ। চোখ বিষন্ন, ম্লান হল। অস্বস্তি বোধ করছিল।

"কী ?" নন্দিকা বলল।

"বলব। ... তোমার কাছে বলতে আর আপত্তি কী।... দাদা, আজকাল মদটদ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্য নেশাও করতে পারে। ভগবান জানে। ওর বিছানার তলায় দিদি টাকাও পেয়েছে। তোশকের তলায়। পাঁচ ছ'শো টাকা। এই টাকা ও কোথা থেকে পেল ? নিশ্চয় ম্যানেজ করে।

... আমাদের বাড়িতে ভীষণ অশান্তি নন্দু। তুমি বুঝবে না। আমরা বেশ ছিলাম। কী হল কে জানে —, এখন সারা বাড়ি ভরে অশান্তি। কথা কাটাকাটি। মায়ের কান্না। বাবা শুকনো মুখ করে বসে থাকে। বাবার শরীর আবার খারাপ হচ্ছে।"

বাইরের ঘটনাবলি দিয়ে আমরা অনেক সময় মানুষজনকে বিচার করে থাকি। এই পদ্ধতি কিন্তু সর্বদাই সঠিক বলে গণ্য হতে পারে না। প্রকৃত তথ্য এভাবে জানা

সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে । ধীরাজ ভেবেছিল মণিকারা বেশ শান্তিতেই আছে । মণিকার মুখ থেকে কিন্তু অন্যরকম শোনা গেল । উপর-উপর যে কিছুই ধরা যায় না—সেটা মণিকা ধীরাজকে জানিয়ে দিয়েছে । ধীরাজ যখন বলল, —

"আমি যখন প্রথম এ-বাড়িতে যাই,
আমার বেশ লেগেছিল । জায়গার কথা
বলছি না, নতুন বাড়ির কথাও বলছি না ।
আমি বলছি, ফ্যামিলির কথা । মনে হয়েছিল,
এরা বেশ রয়েছে । সুখী পরিবার । নিজেদের
মধ্যে মানুষগুলো জড়িয়ে আছে । ...পরে —"

ধীরাজের কথা শেষ হয়নি, বাধা দিয়েছে মণিকা, —

"সুখী পরিবার ? "মাথা নাড়ল, "না,
ভুল । হয়তো মা-বাবা তাই চেয়েছিল ।
হয়নি । আমরা আর সুখী নই । ছিলাম
কিনা তাই বা কে জানে ।"

সীতেশ নিজের পছন্দসই বিয়ে করতে চায় । সে এ ব্যাপারে মায়ের কোনও কথাই শুনতে রাজি নয় । রজনীকান্ত গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চান না । তিনি স্ত্রীকে সব কিছু মেনে নিতে বলেন । প্রতিভা কিন্তু রাগে, উত্তেজনায় আর অপমানে কাঁপছিলেন :

"কে চেয়েছে তোমার ছেলের দিকে হাত
বাড়াতে । আমি চাইনি । ওর যাকে খুশি
বিয়ে করুক ; যেমন খুশি থাকুক । আমি
পরোয়া করি না - । তা বলে, আমার এই
বাড়ি, আমার সংসার, এখনও আমার ।
আমি মরে যাইনি । তুমি ভেব না তোমার
ছেলের হাতে তুলে দিয়ে যাবার জন্যে বুকের
রক্ত দিয়ে এ-সংসার আমি গড়েছি । যতদিন

বেঁচে আছি — আমি কিছু ছাড়ব না । আমায়
শ্মশানে তুলে এসে তোমরা হাঁফ ছেড়ো । তার
আগে নয় । কিছুতেই নয় ।

যুক্তির দিক থেকে প্রতিভা হয়তো সর্বাংশে সঠিক নন ; কিন্তু মায়ের বুকে কতখানি ব্যথা বাজলে এ-ধরনের কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে — তা সহজেই অনুমেয় ।

হবু শ্বশুর মশায়ের চিঠির উত্তর না দেওয়ার জন্যে সীতেশ মা-বাবার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে । প্রতিভার সাফ জবাব 'আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা তুলো না ।.... আমাদের ওর মধ্যে ডাকবে না ।' সীতেশ আক্রোশে ফুঁসছিল । মায়ের উপর তার অদ্ভুত ঘৃণা হচ্ছিল । সে 'পস্তাতে হবে' — বলে মাকে হুমকি দেয় । আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না প্রতিভা ।

"কী বললে তুমি ? আমায় পস্তাতে হবে ?
আমি তোমার পয়সায় খাই না পরি ।
আমাকে খাওয়াবার লোক এখনও বেঁচে
আছে । সে যখন থাকবে না, আমার
মেয়ে আছে, মতু আছে । তোমার পয়সায়
আমি খেয়ে পরে বাঁচব না ; তার আগে
মরব ।"

"পরে কী করবে সেটা অন্য কথা ।
... তোমাদের সংসারে আমি টাকা দিই না ?"
"কী দাও । পাঁচশোটা টাকা হাতে ফেল দাও ।
নিজে থাকছ, খাচ্ছ, নবাবি করছ, আর মা
বাবার বেলায় পাঁচশোটা টাকা !.....
অনেক কর্তব্য করেছ । এই বাড়ি যে-মানুষটা
করেছে তার বুকের রক্ত তুলে সে আজ ভিখিরি ।
দেনায় দেনায় বিকিয়ে গেছে । সে-দিনও দু'হাজার
টাকার জন্যে মাথা খুঁড়েছে । দিয়েছ তুমি এক পয়সা ?

কোনোদিন দিয়েছ ? মেয়ে জোগাড় করে টাকা
এনে দেয়, আর তুমি স্বার্থপর, জ-তু, তুমি
তোমার ফূর্তি নিয়ে থাকো, মদ খাও, মেই
ছুঁড়ির জন্যে জিনিস কেন, নাগবাবুর কাছে গিয়ে
চুরি করে গয়না গড়াতে দাও ! ....তুমি ভাবছ,
আমি অন্ধ ! জানি না কিছু, কানে শুনি না—!
অসভ্য, ইতর, চোর ....." প্রতিভা দাঁড়িয়ে
পড়েছিলেন, রাগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন,
চোখ মুখ লাল, কপালের শিরা যেন ফুলে উঠে
দপদপ করছে, শাড়ির আঁচল মাটিতে।

সীতেশও যেন পাগল হয়ে গিয়েছে, রাগে
সেও কাঁপছিল, চোখ হিংস্র। চিৎকার করে বলল
"একটা বাড়ি করে তোমরা যেন মাথা কিনেছ ! অত
বাড়ি বাড়ি কিসের ! হাজার হাজার লোক বাড়ি
করছে। যদি ভেবে থাকো বাড়ি করে আমাদের
উদ্ধার করেছ, স্বর্গে যাবার সময় নিয়ে যেয়ো
তোমাদের বাড়ি। আমি গ্রাহ্য করি না। বাড়ির মুখে
আমি পেচ্ছাপ করি ....."সীতেশ চলে যাচ্ছিল
কাঁপতে কাঁপতে, দু চার পা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে
দাঁড়াল। বলল, "আর মেয়ের টাকা দেবার
কথা বললে ! টাকা সে দিতে পারে। তার
অভাব কি ? ওই ছেলেটা আছে—ধীরাজ। বিজনেস
করে। ও-বেটা ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে, ফাল হয়ে বেরুবে ...!'

প্রতিভার আর জ্ঞান ছিল না। খাবার টেবিলে
অতীশের ফেলে-যাওয়া কাচের বড় প্লেটটা পড়েছিল,
একটা প্লেট। ঝাঁপ দিয়ে প্লেটটা তুলে নিলেন প্রতিভা।

তারপর ছেলের মুখের দিকে ছুঁড়লেন ।

সীতেশ মাথা সরিয়ে নিয়েছিল ।

প্লেটটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল মেঝেতে ।

প্রতিভা পাগলের মতন ছেলের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, মণিকা দাঁড়িয়ে পড়েছে আগেই ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপছিল । প্রতিভাকে ধরতে গেল ।

প্রতিভা হঠাৎ কেমন দাঁড়ালেন, টাল খেলেন, তারপর পাশের দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন । মণিকা সামলাতে পারল না । চেয়ার সমেত মাটিতে পড়ে গেল দু'জনেই ।

দীর্ঘ উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা গেছে —তিক্ত বাদানুবাদের মধ্যে সীতেশ শুধুমাত্র তার মাকে চরম অপমান করেই থেমে যায়নি; সহোদরাকে জড়িয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করতেও কুণ্ঠাহীন সে । মণিকার মনেও ভয় জাগেনি যে, তা নয় । কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে —চিন্তাতেও আসেনি তার । এর পর কী ঘটবে ? —ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠেছে সে ।

একটা ব্যাপার মণিকা এখন স্পষ্ট করে জেনে ফেলেছে । এ-সংসারে পা রাখার জোর তার নেই । যতদিন মা-বাবা আছে ততদিন সে আছে । পরে থাকবে না; থাকতে পারবে না । সীতু কেমন করে পালটালো পরে আরো পালটাবে, অন্তত পালটাতে পারে ।

মানুষ গাছ পাতা ফুল নয় যে, তার বদল নেই । কত ভাবে সে বদলে যায়, কতরকম ঘা লাগে তার গায়, কখন কোনদিকে মন টানে কে বলতে পারে !

রজনীকান্ত বোঝেন কারও পক্ষেই চিরকাল কর্তৃত্বের রাশ টেনে ধরা সম্ভব নয়। একটা সময় আসে, যখন সেটা অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়। তখন হাহাকার করলে চলবে কেন? প্রতিভা কিন্তু এই রূঢ় বাস্তবটি বুঝতে চায় না; রজনীকান্তর মনে দুঃখ রয়েই গেল। ওষুধের ঘুমে প্রতিভা যখন আচ্ছন্ন তখন তার সেই ঘুমের ভিতরেই এতদিনকার সুখ-দুঃখের সাথীর সঙ্গে কথা বলেন রজনীকান্ত:

তুমি জানবে, বাপ-মায়ের কাছ থেকে ওরা যা
পায় — সেটা তারা পাওনা বলে মনে করে।
পাওনা ফুরিয়ে গেলে বলে, এবার তোমরা সরে
দাঁড়াও।

"আমরা কি শুধু দেবার জন্যে আসি।
অদ্ভুত কথা তোমার।"
"হ্যাঁ, দেবার জন্যে। কথাটা সত্যি।
পাব আশা করে মানুষ ভগবানকেও ডাকে।
না-পেলে ভগবানকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
আর আমরা তো নেহাতই বাপ - মা।"
"ওরা এত স্বার্থপর?"
"স্বার্থপর নয়, সংসারী। কাজে লাগা
জিনিস কেউ ফেলে না সংসারে। যখন
আর লাগে না — তফাতে সরিয়ে রাখে।"

রজনীকান্তের মনে হল, গভীর ঘুমের মধ্যে প্রতিভা যেন হঠাৎ বড় করে শ্বাস টানলেন। শব্দ হল গলার।
স্ত্রীকে আবার একবার সতর্কভাবে দেখে নিলেন রজনীকান্ত। কান্ত অবসন্ন লাগছিল নিজেকে। বুকের তলায় ব্যথা করছিল।
হঠাৎ তাঁর মনে হল, এই বাড়ি তিনি কেন করেছিলেন? আশ্রয় না গৃহসুখের জন্যে?

নাকি ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিয়ে যাবার
জন্যে ? নাকি নিজের কৃতিত্ব দেখাতে ?

আসলে, সুখ খুঁজতে গিয়েছিলেন রজনীকান্ত। অনেক আশাতে বুক বেঁধেছিলেন প্রতিভা। কিন্তু দমকা বাতাসে শুকনো পাতার মতই উড়ে গেছে সেই সুখ। একই সঙ্গে অ-সুখের তীব্র যন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠেছে দুটি প্রাণ : জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত—অতি ক্লান্ত রজনীকান্ত এবং প্রতিভা।

উপন্যাসটি আলোচনা-কালে প্রথমেই মনে রাখতে হবে কথাকার মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের এক জটিল ও জ্বলন্ত সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বাবা-মা কত কষ্ট করে সন্তানকে বড় করে তোলেন ; সন্তানের উপর কত আশা তাদের। কিন্তু সকল আশা-আনন্দেরই পরিসমাপ্তি ঘটে — যখন সেই সন্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবসময়ে নিজের চিন্তা-ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দেয় ; ভুলে যায় তার উপরে বাবা-মায়ের দাবি থাকতেই পারে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। সীতেশ তার বিয়েকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে —তাকে শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠিতে বিচার করা যেতে পারে না। সীতেশের নিজস্ব মতামতের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রতিরুদ্ধ হয়ে তাকে ওইরকম হিংস্র হয়ে উঠতে হবে কেন ? সর্বসমক্ষে সীতেশের অশালীন-রূঢ় আচরণ তার চারিত্রিক অভব্যতা এবং অধঃপতনকে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছে। প্রতিভার কথার মধ্যে ক্ষোভ-অভিমান অপ্রকাশিত নয় ; কিন্তু সীতেশ কখনও তার মায়ের ব্যথাকে উপলব্ধি করতে চায়নি। সে বড় নির্দয়। বাবা-মা-ভাই-বোন—কেউ-ই তার আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ধীরাজকে জড়িয়ে মণিকার প্রতি তার অশ্লীল ইঙ্গিত প্রমাণ করে—সে কত নীচে নামতে পারে। উন্মত্ত -স্বার্থপরের মত তার আচরণ সকলকে বিমূঢ় - নির্বাক করেছে। সীতেশের প্রসঙ্গে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। অসৎ-সঙ্গ স্বার্থপরতা প্রভৃতি তাকে খারাপ করে তুলেছে, — কিন্তু শুভবোধের প্রতি তার চরম ঔদাসীন্য আমাদের বিস্মিতও করে। চরিত্রটির মধ্যে দ্বন্দ্বের যাত্রা যোজিত হলে, তা আরও সজীবতা পেত বলেই মনে হয়।

মণিকা এই উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়েও সুখের স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। স্বামীর ঘর করতে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। মণিকার স্বামী নামেই মানুষ, আদতে সে একটি পশু। সে শুধু ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতেই জানে, ভালবাসার জাদু ছিল তার কাছে অজানা। বাবা-মার কাছে ফিরে আসার পরেও কিন্তু মণিকার মনে শান্তি নাই। স্বামীর উন্মত্ত আচরণে বিমূঢ় হয়ে সে চিন্তা করেছে —এর পর কী হতে পারে? ...বাবা-মা যতদিন, ততদিনই সংসারে তার আশ্রয় জুটবে; কিন্তু তার পর? মণিকার মত একটি সুন্দর মেয়ে যে-ভাবে সামাজিক ব্যাধির শিকার হয়েছে; নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তার প্রখর স্রোতে ভেসে চলেছে, তাতে সহানুভূতিবোধে আচ্ছন্ন হতে হয়।

ধীরাজ আমাদের প্রিয় এক চরিত্র। তার উজ্জ্বল নির্মল উপস্থিতি আমাদের মুগ্ধ করে। এই খোলামেলা পরোপকারী যুবকটির চারপাশেও কিন্তু অসুস্থতার ছায়া। তাদের পরিবারে হার্টের একটা অদ্ভুত রোগ আছে। সকলে অসময়ে মারা যায়। ধীরাজেরও হার্টের অল্পবয়স থেকেই গোলমাল। ধীরাজ মণিকার হতাশালাঞ্ছিত জীবনে স্বস্তি এবং সুখের বাতাস বয়ে নিয়ে এসেছে, কিন্তু বংশগত অদ্ভুত রোগের আশঙ্কা তাকেও সঙ্কোচের গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছে। তা হোক, ধীরাজ কিন্তু মানবিক আবেদনে নিটোল। অসুস্থতা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও স্বচ্ছ করেছে, এবং এই স্বচ্ছতা তার ভালবাসা আর সততার আবেদনকে করেছে স্বতঃস্ফূর্ত —প্রগাঢ়।

লতিকা বা লতুর কাছে জীবনটা এক চ্যালেঞ্জ। একটা সময় সুখের মধ্যেই তাদের দিন কাটত। কিন্তু তার ভাই খুন হয়ে গেল, আর বাবা প্রায় পাগল হয়ে কিছুদিন পরে মারা গেলেন। সব কিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। তার পর থেকেই লড়াইয়ের শুরু। এ-লড়াই অভাব নামের রাক্ষসটির বিরুদ্ধে। টাইপ আর টিউশন করে নিজের এবং রুগ্ন মায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা লতিকাকে যে-ভাবে ভাবতে হয়েছে, তাতে পরিষ্কার —এই মেয়েটি হার মানতে শেখেনি; সে পথ যতই ব-ধুর হোক না কেন। অতুর সঙ্গে ব-ধুত্ব তার মানসিকতাকে আরও সংহত করেছে।

অবশেষে আমাদের আবার সেই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার কথা বলতে হবে, যাঁরা জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন —সুখের সন্ধানে আকুল হয়েও আজ একেবারেই নিঃস্ব তাঁরা। এই নিঃস্বতা অন্তর এবং বাহির —দুই দিক থেকেই।

একজন ব্যর্থতা-পরাভবকে মেনে নিয়েছেন, অন্যজন পারেননি। অনেক কষ্টে একটি ঘর তৈরি করেছিলেন রজনীকান্ত। অনেক যত্ন নিয়ে সংসারটি সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন প্রতিভা। তাঁদের কাছে স্বপ্নটা অ-ধরাই থেকে গেল। উপযুক্ত সন্তানের কাছে বাবা-মায়ের ভূমিকা কী নিতান্তই গৌণ,—একবুক হাহাকারের মধ্যে রজনীকান্ত এবং প্রতিভা সেই কথাই চিন্তা করেছেন। মতের অমিল বা যুক্তি-তর্কের অবকাশ থাকতেই পারে; কিন্তু বাবা-মায়ের সঙ্গে আত্মজ-আত্মজার সম্পর্ক সব কিছুর ঊর্ধ্বে, সেখানে সংঘর্ষের স্থান কোথায়? অথচ এক ভয়ঙ্কর কালবেলায় অস্বীকৃত হয়েছে সব কিছুই। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মানবিকতার আবেদন—পবিত্র মূল্যবোধ। সংসারের শান্তিই শুধু নষ্ট হয়নি, ঘরের আনন্দ-ই শুধু হারিয়ে যায়নি, শেষ হয়ে গেছে মনের সুখ: হৃদয়তলে জেগে আছে শুধু অ-সুখের বুদ্বুদ।

বর্তমান পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত নয় বোধকরি কোনও মানুষ। সব কিছুর মধ্যেই রয়ে যায় অনিশ্চয়তার শঙ্কা। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে না পারার নিদারুণ ব্যর্থতা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মতই আমাদের সত্তাকে ক্ষয় করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। উপদ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনের এই স্বপ্ন-ভাঙা শোক, উদাসী বিশৃঙ্খলা বড় ভয়াবহ। যাবতীয় নিষ্ঠুরতা দিয়েই দস্যুর মতন তা এলোমেলো করে দেয় আমাদের সাজানো বাগান, অথবা সাজানোর সযত্ন আকাঙ্ক্ষা। জন্ম থেকে মৃত্যু বা জন্ম আর মৃত্যু — সব কিছুর মধ্যেই তখন উপলব্ধ হয় এক অনিবার্য ও অবিভাজ্য হাহাকারের ইঙ্গিত।

'বেদনাপর্ব' (১৯৮৭) উপন্যাসে নামকরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন তার বক্তব্য। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যে-জীবনের ছবি নির্মোহ এবং দর্শননিষ্ঠ ভঙ্গিতে ফুটিয়েছেন, তাকে এককথায় বেদনাপর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। উপন্যাসে প্রত্যক্ষত এবং পরোক্ষত যে-সব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তারা সকলেই সুখহীনতায় বিধ্বস্ত-বেদনায় বিপন্ন। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে

ফাঁকটা কোনও দিনই চরিত্রগুলিকে সুস্থিতে থাকতে দেয়নি । শচীনবাবু, বসুধা, রানু, বিবি —এই প্রধান চার চরিত্রের সঙ্গে আরও কিছু মানুষের জীবনেও ছায়ার মত জড়িয়ে রয়েছে অ-সুখ । একটি মানুষের আশস্মিক মৃত্যু আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে কাহিনীর গতিকে । কিছু জিনিস একজনকে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল মানুষটির । পৌঁছানো হয়নি । পথিমধ্যে আকস্মিক মৃত্যু তাঁর দুঃখময় জীবনের যবনিকা টেনে দিয়েছে ; একই সঙ্গে অবকাশ দিয়েছে মানবজীবনের বিস্তৃত বেদনাপর্বটির স্বরূপ সন্ধানেও ।

বসুধার জন্ম-দিনেই মারা গেলেন শচীনবাবু । একটি প্যাকেট আর চিঠি নিয়ে তিনি আসছিলেন বসুধাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে । ওই সমস্ত পাঠিয়েছিল রানু । শচীনবাবু বসুধার কাছে সম্পূর্ণই অপরিচিত । মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সুদূরের মানুষটি কিন্তু তার মনের দরজায় কড়া নেড়ে গেলেন । ঝড় উঠেছে বসুধার মনে । শচীন-মামার মৃত্যুতে বেনারস থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছে রানু । দেখা হয়ে গেছে অনেক দিন পরে বসুধার সঙ্গে । কিন্তু স্তব্ধ-সুর এলোমেলো জীবনের যে বিকৃত পর্বটি তাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে —সেখানে জমাট হয়েছে আর্তি । তাকে এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ।

উপন্যাসের মধ্যে প্রথমাবধি বসুধার মনে নিঃসঙ্গতার বোধ লক্ষ্য করা গেছে । এই একাকিত্ব তাকে আর পাঁচটা জীবনের দোর-গোড়া থেকে ফিরিয়ে দিতে তাগিদ দিয়েছে । জন্মদিনে মাসিদের বাড়িতে নেমন্তন্ন, কিন্তু তুমুল বৃষ্টির মধ্যে সে সল্ট লেকে পৌঁছাবে কী করে ?

> বসুধার আচমকা মনে হল, আজও এক দফা
> আকাশ ভাঙা বৃষ্টি এখনও হতে পারে । হলে
> মনোমাসির বাড়ি যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে ।
> কিন্তু .....ওই বন্ধতে কতটুকু যায় আসে ।
> একবেলা দুবেলার বন্ধ কিছু নয় । বরং বসুধার
> মনে হল, মনোমাসিদের এই সংসার, যেখানে এক
> ধরনের সুস্থিতি, শান্তি, নিভৃত অন্তরঙ্গতা, এবং
> চাপা দুঃখ নিয়ে ওরা বেঁচে আছে --- বসুধা সেখানে,

সেই জগতে কোনো দিনই হয়ত যেতে পারবে না।
সব পথই যেন ব-ধ। প্রবেশপথ সত্যিই নেই।

জ-মদিনে বসুধাকে সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বিবিও। সুখ-শুভেচ্ছা। বিবির জীবন থেকে কি-তু সুখ অনেক দিন আগেই হারিয়ে গেছে।

"* * * ও হো, সুধা দা—তোমাকে বার্থ ডে উইশ করিনি। তোমার নয়া একটা লাইফ্ হোক, বী হ্যাপি —" বিবি হাসতে লাগল, পা দুলিয়ে ছেলে-মানুষের মতন।
বসুধা হাসল। বিবির চোখমুখ লক্ষ্য করছিল সে। কথা বলতে বলতে বিবি কিছু ভাবছে নাকি? বা তার কিছু মনে পড়ছে? হ্যাপি। কে সুখী, কে সুখী নয়, কার কোথায় সুখ কোথায় অ-সুখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বিবি নিজে কি সুখী? আজ বছর তিনেক হতে চলল সে বিয়ে ভেঙে চলে এসেছে। বিবির বয়েস কত? ঊনত্রিশ ত্রিশ হবে। তার বিয়ে হয়েছিল বছর পঁচিশ বয়সে —বা সামান্য আগেও হতে পারে। দু আড়াই বছর স্বামীর সঙ্গে, সঙ্গে না হোক—স্বামীর বাড়িতে ছিল, তারপর ভেঙে গেল সম্পর্ক।

একটা গান বিবিকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। গানের কথাগুলি চমৎকার।.....
"ইফ ইউ আর সিয়োর ইউ আর অল রাইট? "রেকর্ডটা বসুধাকে আনতে বলেছিল সে। গানটি বিবির মনে সংশয়ের ঢেউ তুলেছে; একই সঙ্গে তা আছড়ে পড়েছে বসুধার ভাবনাতেও।

"ইফ ইউ আর সিয়োর ইউ আর অল রাইট।
.....না সুধা দা, ঠাট্টা নয়। তুমি দেখো, ঠিকঠাক ভেবে দেখো, আমরা সত্যি কি

অল্‌রাইট হয়েছি । মনে হয় আছি—কি-তু
আর ইউ সিয়োর ?' * * * *
বসুধা মাথা নাড়ল । নিজে খেয়ালও করল না ,
সে কখন ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছে । চাপা
গলায় , ভেতর থেকে যেন বলল ,''না আমি
সিয়োর নই । আজও নই ।''

খোলা মেলা যে জীবনের স্বাদ বসুধা একদিন পেয়েছিল , সেই জীবনটা হারিয়ে গেল কোথায় । আকাশটা এখন সরে যাচ্ছে বহুদূরে । তারা দেখতে গেলে কত না কসরৎ করতে হয় । মেসের ছোট ঘরের মধ্যে বসুধা যা চিন্তা করেছে — তাতে বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধতার পাশাপাশি অতীতানুরাগের প্রকাশ অস্পষ্ট নয় :

বসুধা জানলা খুলে দিল । জানলা খুলতেই
পাশাপাশি বাড়ির ছাদ , জানলা, জলের ট্যাংক ,
টেলিভিসনের অ্যান্টেনা , চিলে কোঠা — আরও
কত কি চোখে পড়ে । আকাশ মাত্র এক টুকরো ।
তারা দেখতে ইচ্ছে হলে — হয় জানলার কাছে
গিয়ে ঘাড় তুলে আকাশ খুঁজে দেখতে হয়, না হয়—
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় । অথচ একসময় বসুধা
আকাশের তলাতেই মানুষ হয়েছে — সে যেন নিজেই
হারিয়ে যাচ্ছে শূন্যে । তারা , আকাশ , গাছপালা ,
কয়লা , মিল , রেলগাড়ি , কতরকম ঘাটবাটের
তরলতার গন্ধের মধ্যে সে মানুষ । আহা , কোথায়
চলে গেল সে-জীবন । কেন গেল ?

গতানুগতিক ভাবেই কাটছিল বসুধার জীবন । হঠাৎ-ই এক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে । একজন ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন । রাস্তায় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি । পরে হাসপাতালে দেওয়ার পর মারা যান । 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক'। মৃত মানুষটির কাছে যে প্যাকেট আর চিঠি ছিল—তাতে বসুধার নাম ঠিকানা । অনিবার্যভাবেই বসুধা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের মৃত্যু আর পাঁচটা মৃত্যুর মতই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারত, কি-তু হয়নি। রানু শচীনমামার হাত দিয়ে চিঠি আর প্যাকেটটা বসুধার জন্যেই পাঠিয়েছিল। ওই মানুষটি কি-তু সেগুলি বসুধার হাতে তুলে দিতে পারেননি। শচীনবাবুর আকস্মিক মৃত্যু বসুধার কাছে নিছক ঝামেলা নয়, গভীরতর আরও অন্য কিছু। রানু ও শচীনমামার যথাক্রমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপস্থিতি কাহিনীগত জটিলতাকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, তেমনিভাবেই ঔপন্যাসিকের মূল বক্তব্য পরিস্ফুটনাতেও সহায়ক হয়েছে।

রানু ছিল সাধনকাকার মেয়ে। বসুধার বাবার ব-ধু ছিলেন তিনি। শহরের স্কুলে পড়বার সময় তাঁর বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল বসুধাকে। রানু ছিল খুব চঞ্চল আর দুষ্টু স্বভাবের। প্রায়ই চেষ্টা করত বসুধাকে জব্দ করতে। সেই সব নবীন মধুর দিনগুলোর মজা হঠাৎই হারিয়ে গেল।

বয়েস আরও খানিকটা বেড়ে যাবার পর
বসুধা যখন অন্যরকম চোখে মাঝে মাঝে
দেখতে শুরু করেছে রানুকে তখন আচমকা
কত কী হয়ে গেল, পর পর।
রানুর এক ভাই ছিল, জিতু ঘুড়ি
ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেল নিচে,
ঘাড় মাথায় লেগেছিল, হাসপাতালে একটা
রাতও আর কাটল না, মারা গেল।
কাকিমার হল পক্ষাঘাত। কাকিমাও মারা
গেল বছর দুয়েকের মধ্যে। ততদিনে
বসুধারাও তফাতে সরে যেতে শুরু করেছে।
তার মা গেল, তারপর বাবা।
রানুর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায়
ছিল না। তারা চলে গেল একদিকে,
বসুধা চলে গেল অন্যদিকে। ঠিকঠাক হিসেব

না করেও বলা যায়, বসুধার কৈশোর ও
প্রথম যৌবনের দিকে রানু তার কাছাকাছি
ছিল, তারপর কে কোথায় হারিয়ে গেল
খোঁজ রাখাও হল না।

সেই হারিয়ে যাওয়া রানুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে বসুধার। শচীনমামার মৃত্যু রানুকে গভীর ভাবে ব্যথিত করেছে। প্রৌঢ় মানুষটি বড় স্নেহ করতেন রানুকে। বসুধা ভদ্রলোককে দেখেনি, কিন্তু তার 'কাছে পুরো ব্যাপারটাই শকিং'। রানুর কাছ থেকে বসুধা জানতে পেরেছে —শচীনমামার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। 'বয়েস হচ্ছিল —শরীর ভেতরে ভেতরে ভাঙছিল। প্রেশারের গোলমাল ছিল, পিঠে একটা ব্যথা হত মাঝে মাঝে। বাইরে থেকে সব তো বোঝা যায় না। মানুষটির জীবন বড় অদ্ভুত।' রানু শচীনমামার অসুস্থতার কথাই শুধুমাত্র বসুধাকে জানায়নি; কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে —তার শরীরও ভাল নয়, টি বি হয়েছিল। রানুর যে টি বি হয়েছিল, বসুধা প্রথমদিকে বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছে রানু ঠাট্টা করছে। কিন্তু পরে রানুর কথাবার্তা থেকে বসুধা বুঝতে পারে, ঠাট্টা নয়, 'রানুর নিজের মধ্যেই এক সতর্কতা রয়েছে।' সে নিজেকে সুতন্ত্রভাবে বিচার করতে চায়। অন্য পাঁচজনের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টাও তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অসুস্থতা সত্যিই রানুকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে। রানু জানিয়েছে :

"আগে আলোদির সঙ্গে থাকতাম,
আলোদির বাড়িতে লোক বেড়ে গেল।
আমারও অসুবিধে হত। তার ওপর
অসুখবিসুখ নিয়ে থাকা .....।"
"অসুখ বিসুখ—"বসুধা মুখ ফিরিয়ে
তাকাল।
"বা: বলেছি না তোমায় —বুকের অসুখ
হয়েছিল, টি. বি.।"
"আরে দূর। টি. বি. আবার অসুখ নাকি

আজকাল। ঘরে ঘরে আছে। আমারও হয়ত রয়েছে। "বসুধা হালকাভাবে বলল, যেন আমলেই আনল না কথাটা।

রানু হঠাৎ বলল, "বেশ তো। ফিরে গিয়ে তোমার মনোমাসিকে আমি বলি কথাটা। তাঁর স্বামীও ডাক্তার দেখি কেমন সহজ করে নেন উনি আমাকে।"

বসুধা খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। কথাটা সে ভাবেনি আগে; একবারও মনে হয়নি।

রানুর কথা ভাবতে-ভাবতে নিজের দিকেও তাকিয়েছে বসুধা। রানুর অবসাদ বিমর্ষতা তার চোখে ধরা পড়েছে ঠিকই; কিন্তু নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ক্লান্তিকে সে অস্বীকার করতে পারবে কি? 'অনুৎসাহ, চাপা বিরক্তি, নিস্পৃহতা' তাকেও আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলেছে।

রানুর কথা থেকে বুঝতে পারা যায়, শচীনবাবুর জীবনটা ছিল বড় এলোমেলো। তিনি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সংসার-সুখ তাঁর কপালে জোটেনি। শচীনবাবুর স্ত্রী বড়লোক বাড়ির মেয়ে, এমনিতে বেশ সুন্দরী, তবে পায়ে খুঁত ছিল তার। 'পায়ের পাতা ছিল ছোট। হাতের মুঠোর মতন। ফোলা ফোলা দেখতে। তবে হাঁটতে পারত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।' টাকার লোভে নয়—এমনিই শচীনমামা ওইরকম মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ক'দিন পরেই সব কিছুর সমাপ্তি। অষ্টমঙ্গলা করতে শচীনমামা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি ফিরেও এসেছিলেন, তবে স্ত্রীকে ছাড়াই। রানু জানিয়েছে,—

স্ত্রীর কাছে থেকে সেই যে চলে এসেছিলেন শচীনমামা, তারপর আর কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি কোনো অন্যায় করেন নি খোঁজ না করে। কারণ নতুন করে কিছু করতে গেলে তাঁকে অপমান সইতে হত।

বসুধা রানুর মুখে শচীনবাবুর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। শচীন-বাবুর স্ত্রীর অঙ্গগত বিকৃতি তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো আর একজনের কথা।

বসুধা দুর্গাপুরে চাকরি করার সময় একজনকে দেখেছিল, রবি দত্ত, এঞ্জিনিয়ার, কাজ পাগল মানুষ। রবি দত্তর স্ত্রী —মিসেস দত্তকে দেখলে সাজানো পুতুল বলে মনে হত। বড় সুন্দর দেখতে মহিলার কোমর থেকে নীচের অঙ্গ একেজো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। হুইল চেয়ারে বসে বসে কাজকর্ম করতেন, সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত দিকেই চোখ রাখতেন, শুধু স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে নিতে পারেননি। রবি দত্ত বলতেন, মেয়েদের খুঁত তাদের মন, অ্যাটিচিউড, ব্যবহার - সমস্ত পালটে দেয়। ভীষণ ডিফেনসিভ করে দেয় তাদের। সব সময় ভাবে, লোকে তার খুঁত নিয়ে মজা করছে। আমার মিসেসকে অনেক বুঝিয়েও কিছু করতে পারলাম না। কত বুঝিয়েছি, বলেছি এ কারুর দোষ নয়, অ্যাকসিডেন্টের পর কন্ডটা হয়ে গেল। বললে হবে কি। কে বুঝতে চাইছে। এক এক সময় এমন ক্রুয়েল হয়ে যায়— আমি বুঝতে পারি না, মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা।

বসুধার মনে হল, শচীনবাবুর স্ত্রী বোধহয় পায়ের অতবড় খুঁতের জন্যে কোনরকম অস্বাভাবিক আত্মরক্ষার পথ ধরেছিলেন। জোর করে অবশ্য বলা যায় না এ-সব কথা। তবু ....।

নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় আমরা লক্ষ্য করি বসুধা এবং রানু দুজনেই বেদনায় আর্দ্র হয়েছে। অতীতের মায়া তাদের মনে সঞ্চার করেছে বিষণ্ণতা। ব্যস্ততার মধ্যে যা বিস্মৃতির গভীরে তলিয়ে যায় — অবসর মুহূর্তে তাই-ই আবার বুকের মধ্যে ঢেউ জাগায়। অতীতের ডালে-ডালে যে ফুলগুলি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছিল, সেইগুলি ঝরে গেছে কবেই। হারানো দিনের মায়ায় ভারাক্রান্ত রানু এবং বসুধা দু'জনেই। বেঁচে থাকার তাগিদে রানুকে এখন সব কিছু করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনের শান্তি কোথায়? কোথায় গেল সেই সুখ? প্রায়শই তার মনে হয়: এ-ভাবে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন।

"আমার কি মনে হয় জানো বাসুদা?
এই যে আমি আছি —চাকরি ঘরবাড়ি
কাজকর্ম খাওয়া ঘুম—এ-সব নিয়ে থাকতে
থাকতে একসময় কখন যেন বুঝতে পারি
আমি এর কোনোটার মধ্যে নেই। কোনো-
টাই আমার নয়। আমি যে-ভাবে আছি
এটা মিথ্যে। আমার থাকা না-থাকার
কোনো মানে হয় না। তখন আমার
মরে যেতে ইচ্ছে হয়।"

বসুধা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পরে নরম গলায় বলল, "মরে যাবার ইচ্ছেটা ভাল নয়, রানু। তোমার যেমন মনে হয় তুমি যেভাবে আছ—এটা মিথ্যে আমারও মাঝে মাঝে সে রকম মনে হয়। হয়ত সব মানুষেরই হয়। আমাদের বেঁচে থাকাটা আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা বোধহয় এক নয়। বেঁচে থাকাটা একটা প্রসেস; নিজে নিজেই গড়িয়ে যায় যতদিন পারে। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা অন্য জিনিস। আমরা ঠিক

পারলাম না।"

রানু বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পরে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনতে পেল বসুধা।

হতাশা যেমন রানুকে জড়িয়ে ধরেছে —তেমনি বসুধাকেও। গতানুগতিকতার ছক থেকে বেরিয়ে আসার অসামর্থ্য যে জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাকেই নষ্ট করে দেয়, এই বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ নাই। নিজেকে জাগিয়ে তোলা, —জাগিয়ে রাখার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা, অথচ এটা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে গেছে। একাকিত্বের যন্ত্রণার মধ্যে শচীনমামার কিছু কথা বারবার মনে পড়ে যায় রানুর।

'শচীনমামা বলতেন, গাছের ছায়া আর মানুষের মায়া—এই দুটি হল তার স্বভাব ধর্ম। ছায়া দেয় না এমন গাছ নেই। গাছ যত ছোটই হোক তার একটু ছায়া থাকবে। মানুষেরও তাই। মানুষের যদি মায়া না থাকে সে মানুষই নয়।'

'তোমার শচীনমামার স্ত্রীর মায়া ছিল?' রানু হয়ত এমন প্রশ্ন আশা করেনি, কথার জবাব দিতে পারল না, চুপ করে থাকল।

অনেক পরে চাপা নরম গলায় রানু বলল, 'একজনের না থাক, অন্যদের তো আছে। জগতের হিসেব পাঁচ জনকে নিয়ে করতে হয়। একজনের কী হল তাতে কিছু আসে যায় না সংসারে।'

মনে হয়, নিছক উপমার জন্যে রানু শচীনমামার কথাগুলি বসুধাকে শোনায়নি, অন্তরের আবেগ দিয়েই সে 'মানুষের মায়া' শব্দ দুটি উচ্চারণ করেছে; বলতে পারা যায়, এ-ভাবেই নিজেকে মেলে ধরেছে বসুধার সামনে।

শ্রাদ্ধ বাড়িতে কিরণবাবুর সঙ্গে বসুধার পরিচয়। উনি শচীনবাবুর ব-ধু। কিরণবাবু মৃত মানুষটি সম্পর্কে অনেক খবর জানিয়েছেন বসুধাকে। শচীনবাবু সুখী ছিলেন না —এ-কথা বসুধা আগেই শুনেছিল। কি-তু মৃত মানুষটির দু:খ যে কত ব্যাপক ছিল, —তা কিরণবাবু খুলে বলেছেন। শচীনবাবুর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, —

"ঠিক যে কেন কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল
বলা মুশকিল। শচীনের মায়ের মাথায় গোলমাল
হয়ে গিয়েছিল। মারা যান অদ্ভুতভাবে।
ছাদের ভাঙা আলসে সমেত পড়ে যান। সেটা
দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা—শচীনও বুঝতে পারত না।
তার ধারণা ছিল, আত্মহত্যা।"

কিরণবাবুর কাছ থেকে জানা গেছে অফিসে শচীনবাবুকে মিথ্যা কেসে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিরণবাবু বলেছেন :

'তোমায় ভাই সত্যি কথাটা বলি—শচীনের
ভেতরটা ছিল সংসারী। সংসারী বলতে
তুমি বিষয়ী বুঝো না। আমি বলছি,
ওর ভেতরে এত মায়া ছিল যে অনেক
কিছু আঁকড়ে নিয়ে থাকতে চাইত। বাইরে
থেকে মনে হবে, না জানি কোন বৈরাগী
পুরুষ। মোটেই নয় —।"

মায়া আর মমতায় আচ্ছন্ন মানুষটি কি-তু নিজস্ব ঘর-সংসার—কিছুই পেলেন না। শচীনবাবুর দুর্ভাগ্যের কথা শোনার সময় বসুধা এমন কিছু জানতে পেরেছে, —যা রীতিমত আশ্চর্যজনক, এ-সবের বি-দু বিসর্গও বসুধা আগে শোনেনি।

কিরণবাবু বললেন, "শচীনের বিয়ের ঘটনা
তুমি জান?" বসুধা মিথ্যে বলতে পারল না।
বলল, "শুনেছি।" "তুমি কী শুনেছ আমি

জানি না। শচীনের বিয়ের ব্যাপারটা ছিল সাজানো। মেয়েটিকে যখন বিয়ে করে শচীন তখন জানত না, আগেই ওই মেয়েটির এক অসিদ্ধ বিবাহ ঘটেছিল। দশ বারো মাসের এক সন্তান ছিল তার। লুকিয়ে এই বিয়েটা দেওয়া হয় শচীনের সঙ্গে।" বসুধা যেন চমকে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই ধরনের জাল জুয়োচুরি, ধাপ্পাবাজি গল্পের বইয়ে পড়া যায়। জীবনে হয় নাকি?

"বিয়ে হওয়া মেয়ের আবার বিয়ে? আবার বাচ্চাও ছিল —?" বসুধা বলল।

"আমি সব কথাটা বললাম না," কিরণবাবু বললেন, "বলেছি অসিদ্ধ বিয়ে। তুমি বুঝে নাও। বড় বাড়ির বড় বড় ঘটনা থাকে; আবার দেনেঅলা ক্ষমতাশালী মানুষকে হাতে রাখার চেষ্টাও থাকে। শচীনকে নিয়ে ওরা যা করেছিল তাতে ওই মেয়ে খুন হতে পারত, শচীন মেয়ে দাদা মাকে পুলিশে নিয়ে যেতে পারত। ব্যাপারটাকে অতদূরে গড়াতে দেয়নি শচীন, শুধু তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেল। শচীনের মা বোধহয় এই আঘাতেই —"

শচীনবাবু তার দুর্ভাগ্যের বৃত্তান্ত কাউকে না বললেও মন থেকে কিছুতে কখনই মুছে ফেলতে পারেনি। তার ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল একেবারে। কিরণবাবু বন্ধুর জন্যে দুঃখবোধ করেছেন। বেদনার মধ্যেও অবশ্য সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ভেবে, —'ওই একা মানুষটির জন্যে তো পাঁচ দশ জনে এসেছে।' এ প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তীব্র দুঃখের মধ্যেও তা সান্ত্বনার অভিব্যক্তি:

মানুষ বোধহয় কখনো একা হয় না, বসুধা ।
দু চারটে লতাপাতা তাকে জড়িয়ে ধরে ।
নয়ত কি বাঁচা যায় ।"

কিরণবাবুর কথাগুলি চিন্তা করতে করতে বসুধার মনে পড়ে গেছে তার বাবার কথা । নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করবার জন্যে সেই মানুষটা সব ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করত । অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে, কিন্তু বাবা পিছিয়ে আসেনি । সংসারে ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি থেকে অনেকে আনন্দ পায়, বসুধার বাবার কিন্তু তাতে কোনওদিন সায় ছিল না । মায়ের ব্যাপারটা আবার সম্পূর্ণই অন্যরকম । সেই বাবা-মা কোথায় হারিয়ে গেল । বসুধার ভাবনার মধ্যে রানুদের ছবিও ভেসে উঠেছে । শুধুই দুঃখ আর দুঃখ । ভাবতে ভাবতে বসুধার চোখ জলে ভরে গেছে ।

কিন্তু মানুষের কি ভাগ্য । হয়ত মায়ের সাধ
ছিল—বাবা চাকরি থেকে ছুটি পাবার পর হয়
আসানসোলের আশেপাশে কোথাও, না হয়
মধুপুর গিরিডির দিকে ছোট্ট একটা বাড়ি করবে ।
ফুলের গাছে ভরে দেবে সামনেটা । পাখি থাকবে
বড় খাঁচায় । বাবাকে সেবা যত্ন আদর দিয়ে
শান্তিতে রাখবে । মায়ের কোনো সাধ পূর্ণ হল
না । মা চলে গেল । বাবাও কি থাকল ? রানুর
বেলাতেও অনেকটা এই রকম । বরং রানুর বেলায়
কাকাবাবু কাকিমা আরও বেশি সয়েছেন । ছেলে
হারিয়েছেন । ঘরবাড়ি হাতছাড়া হয়েছে । মাথায়
ভেঙে পড়েছে আপদ বিপদ । মাথার গোলমাল
হয়ে গিয়েছিল দুজনেরই । কাকাবাবুরই বেশি ।
বসুধার খেয়াল হল তার চোখে জল এসে পড়েছে ।
জানালা দিয়ে বাতাসের যে দমক এল সেই দমকের
সঙ্গে যেন কত কালের পুরনো, ইট খসা বাড়ির
গন্ধ ভেসে এল, নোনা গন্ধ ।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে বিবির অ-সুখ , তার যন্ত্রণার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশিত । বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে । বিবি এখন নিজের মত করে থাকতে চায় ; এই ভাবেই বেঁচে থাকার ইচ্ছা তার । নতুন করে আর কোনও ঝামেলাতে পা বাড়াতে সে রাজি নয় । মেয়ে বলেই তাকে একটি পুরুষের 'স্লিপিং ম্যাট্রেস ' হতে হবে —এই ধারণাতে তার গভীর অনাস্থা , ভাল ছেলের সঙ্গে নতুন করে সংসার করার প্রস্তাবও সে নাকচ করে দিয়েছে বিরক্তির সঙ্গেই । বিবি তার 'ম্যারেড-লাইফের ' কথা বসুধার কাছে খুলে বলেছে । বসুধা এত কিছু জানত না । বিবির বর্ণনার মধ্যে শুধু যন্ত্রণা-অ-সুখের প্রদাহ ।

> বিবি বলল ,"মা তোমায় কী বলেছে সেটা এখন ভুলে যাও । আমি তোমায় বলছি সুধা দা , বিয়ের পর আমি যা দেখেছি , যাদের সঙ্গে আমায় থাকতে হয়েছে , তারা এক একটা জন্তু । আমার দিন ওই জন্তুদের মধ্যে কেমন করে কাটত আমি জানি । বাইরে থেকে কে বুঝবে ।

বিবি তার শ্বশুর-শাশুড়ির যে বর্ণনা দিয়েছে --তাতে শুধু কদর্যতা ও নোংরামি । বিবি তার স্বামী সম্বন্ধে বসুধাকে জানিয়েছে :

> "আমাকে যে বিয়ে করেছিল – সে ভেবেছিল , আমি তার ঘরে জায়গা পেয়েছি—কতকগুলো কাজ মেটাবার জন্য । তার জামা প্যান্ট গোছাবো, কাচিয়ে রাখব , তার দাড়ি কামাবার সাবান ফুরিয়ে গেলে আনিয়ে রাখব , বিছানা পরিষ্কার করব আর তার পাশে শুয়ে থাকব রাত্তিরে— । ব্যাস এই আমি ! বসুধা চোখ সরিয়ে নিল । "আমি লুকিয়ে লজ্জা করে তোমায় কিছু বলছি না , সুধা দা আমি যা বলছি স্পষ্ট । বারো আনা পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েরা নেসেসিটি ।

তাদের পার্ট অব লাইফ নয়। মুখে যে যাই
বলুক আমরা তোমাদের গোলাম।''

স্বামীটি যে কোনও অংশেই মানুষ ছিল না,—সে কথা বিবি জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছে। বিবি ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে,—'ছেলেটা এক ধরনের লোভী, কামুক, নির্বোধ ছিল। স্ত্রী হিসেবে, মানুষ হিসেবে বিবি ও বাড়িতে কারও কাছে কোনো মূল্য বা সম্মান পেত না।' শুধু তাই নয়—প্রতিবাদ করায় শেষ পর্যন্ত বিবিকে ওরা ভয় পেতে শুরু করেছিল। এমন কী তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও হয়েছিল। বসুধা সেকথা শুনে শিউরে উঠেছে।

বিবি বলল,''একদিন তো আমায় গ্যারেজ ঘরে
নিয়ে গিয়ে গাড়ি চাপা দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল।''

''যাঃ! কি বলছ?'' বসুধা আঁতকে উঠল।

''বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে বলছি না, সুধা দা।
গাড়ির চাকা আমার পা কোমরের ওপর দিয়ে চলে
গেলে হয় মরতুম, না হয় খোঁড়া পঙ্গু হয়ে থাকতাম।
তখন ওরা আমাকে মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিত।
ওরা সেটা চাইছিল। আমি ওদের মেনে নিচ্ছিলাম না,
ঝগড়া করছিলাম; আমার কথাকে ওরা ভয় পেতে শুরু
করেছিল। রাগে জ্বলত। শ্বশুর লোকটাকে আমি অপমান
করতাম, কাউকে ছাড়তাম না। ওরা আমায় সহ্য করতে
পারছিল না। আমিও পারছিলাম না।''

বসুধা বিবির অবস্থা বুঝতে পারছিল। 'এই মেয়েটি নিজের সম্ভ্রম, অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতাকে হারাতে চায় না।' বিবি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রবল বিপত্তির মধ্যেও সে হার মানেনি। হার না মানার জেদ নিয়েই বিবি চেয়েছে এগিয়ে যেতে। বিবি বলেছে ভবিষ্যতে কি হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বিশেষ লাভ নাই। কার ভাগ্যে কী আছে—বলতে পারবে না কেউই।

আমি জানি আমরা ভাবি —অমুক হলে বেশ তো থাকা যেত। কিন্তু কেউ কখনো বেশ থাকে না। সেই যে গানটার কথা তোমায় বলতাম, সেই রেকর্ডটা তো আর পেলে না, পেলে শুনতে কী সুন্দর গান। সব মানুষেরই এই প্রশ্ন : ইফ ইউ আর সিয়োর ইউ আর অল রাইট ?... আমরা যদি খোঁজ করি, বুঝব, কেউ অল্ রাইট নেই।" বসুধা সব বুঝেশুনেও হালকা করে বলল, "তুমি তো নও বুঝতেই পারছি।" "আমি। শুধু আমি—?" বিবি যেন বসুধার কথা শুনে কতই অবাক হয়ে গিয়েছে, বলল, "শুধু আমি হব কেন ? তুমি তোমার রানু, তোমাদের সেই বেচারী ভদ্রলোক— কে আর অল রাইট আছে ? ছিল ?"

তাৎক্ষণিক উত্তর বসুধা দেয়নি। অসুস্থ পৃথিবীর বুকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা আর রুগ্ন জীবনটাকে কোনওক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে কত যন্ত্রণা — অতৃপ্তি, অজানা নয় বসুধার। সত্যিই 'কেউ অল্ রাইট নেই।

রানুর ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এল। পুজোর সময় তাদের ওখানে যাওয়ার জন্যে সে আমন্ত্রণ জানায় বসুধাকে। বসুধার উত্তর রানুকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ; কিছুটা অভিমানও তার হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে রানু বলল, "দেখো বাসুদা, আমি কেমন করে তোমার খোঁজ পেয়ে —কত দূর থেকে ছুটে এলাম। আর তুমি একটিবার আমার কাছে যাবার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে চাইছ না। তোমরা পুরুষ মানুষরা কেমন স্বার্থপর হও। গা এড়িয়ে থাকতে চাও।"

* * * * * *

অন্যমনস্কভাবে বসুধা বলল, "গা এড়িয়ে
আর কোথায় থাকা গেল ? তুমি —"
কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল । থেমে
যাবার পর তার মনে হল, বসুধা যে কী
বলতে যাচ্ছিল নিজেই জানে না ।

ইদানীং বসুধা একটা চিন্তাতেই আচ্ছন্ন । শচীনবাবুর মৃত্যু তাকে স্থির থাকতে দেয় না । তার জন্মদিন এবং সেটাই শচীনবাবুর মৃত্যুদিন —মিলে মিশে একাকার । কী অদ্ভুত ঘটনা । স্বপ্নের ভিতরেও বসুধাকে শচীনবাবু ধরা দিয়েছেন । তিনি তাঁর হাতটা যেন বসুধার দিকেই এগিয়ে দিয়েছেন । স্বপ্নের মধ্যেই বসুধার অনুভব : সে নিজেই কখন শচীনবাবু হয়ে গেছে ।

ঘুম ভেঙে গেল বসুধার । মাঝ রাতের
বৃষ্টি যেন তার জানলা ভেঙে ঢুকে পড়েছে,
বিছানা ভিজে গিয়েছে । শীত শীত করছিল
বসুধার ।

ভোর রাতে জানলা খুলল বসুধা আকাশে
সাদা নেই । ধোঁয়া জমে আছে যেন । বৃষ্টির
মিহি শব্দ । এখনও কাক ডাকেনি । মানুষ
জনের সাড়া নেই । বাতাস ঠান্ডা ।

হঠাৎ এই ভোর রাতেই বসুধা কেমন
দুর্ভাবনায় পড়ে গেল । রানু আজ চলে যাবে ।
কি-তু কেমন করে যাবে ? এমন বৃষ্টি, দুর্যোগ ?
বসুধা কি রানুকে নিয়ে আসতে পারবে ?

বৃষ্টিও থেমে যেতে পারে, আবার সারা
দিন দুপুর হয়তা পশলায় পশলায় বৃষ্টি চলল ।
তখন ? তখন—, বসুধার মনে হল, রানুকে
সে আর পৌঁছে দিতে পারবে না ।

উপন্যাসটির আদি থেকে অন্ত —প্রকৃতই বেদনার পর্ব । এই বেদনা জীবনের । শান্তিহীন সুখহীন - স্বস্তিহীন মানবজীবনের স্বরূপ ঔপন্যাসিক উদ্‌ঘাটন করেছেন , — যাতে বি-দুমাত্র প্রমাণিত হয় না : আমরা ভাল আছি , অন্তত কিছুটা ভাল আছি । শচীনবাবু শান্তিতে ছিলেন না । স্বস্তি নাই বানু এবং বসুধার মনেও । অ-সুখের যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছে বিবিকে । তারা যে ভাল থাকতে চায়নি এমন নয় , — কি-তু সংশয়ের যন্ত্রণা , নিঃসঙ্গতাবোধ , দুঃখের আর্তি , নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে চূড়ান্তমাত্রাতেই ব্যর্থ করেছে । এই ব্যর্থতা থেকেই জন্ম নিয়েছে অসুস্থতা । কবির ভাবনাতে এই অসুস্থতার ছবিটি যে-ভাবে ধরা পড়েছে ; —

সমস্ত পৃথিবী ভ'রে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে । — বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে । কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস , —
যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন ।
(জীবনানন্দ ,'জীবন ')

শচীনবাবু ছিলেন নিপাট এক ভাল মানুষ । অথচ তাঁর জীবনটা দুমড়ে-মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল । আর পাঁচ জনের মতই তিনি বিয়ে করেছিলেন । চেয়েছিলেন গৃহসুখ , মমতায় মোড়া সংসার । কি-তু দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেছে সব । উপন্যাসে তাঁর স্ত্রীর যে বিবরণ আমরা পেয়েছি —তাতে শিউরে উঠতে হয় । শচীনবাবু প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত হয়েছিলেন । অষ্টমঙ্গলার পরের দিন শ্বশুরবাড়ি থেকে সেই যে মানুষটি একলা চলে এসেছিলেন , তার পর থেকে কোনও সম্পর্কই ছিল না স্ত্রীর সঙ্গে । শচীনবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন অদ্ভুতভাবে । তাঁর মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল । দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা—জানা যায়নি । তবে ছেলের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারেও হতে পারে । সংসার করতে গিয়ে শচীনবাবু শুধু চরম আঘাত পেয়েছিলেন এমন নয় , কর্মজীবনেও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি । তাঁর ভিতরটা ছিল মায়াতে আচ্ছন্ন , কি-তু বারে-বারেই প্রবঞ্চিত হতে হয়েছে তাঁকে । শচীনবাবু কোনও দিনই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন নি । এমন কী , শেষ মুহূর্তেও । এবং বলা যেতে পারে

মৃত্যুতেই তাঁর বেদনাপর্বের সমাপ্তি।

কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম – অবিরাম ভার
সহিবে না আর —'

(জীবনানন্দ, 'আট বছর আগের একদিন')

কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, রানু এবং বসুধার কাছে অতীতটা হল এক মনোরম অভিজ্ঞতা। সুপ্তময় সেই জগৎ থেকে নির্বাসন—দু'জনের মনের মধ্যেই বেদনাভাসকে প্রগাঢ়তা দিয়েছে। হারানো দিন—হারানো মানুষদের জন্যে অপরিসীম আর্তি প্রমাণ করে বর্তমানের বুকে তাদের বিচরণ স্বাচ্ছন্দ্যরহিত। রানুর মনে যে-ভাবে মরে যাওয়ার ইচ্ছাটা তীব্র হয়েছে, তাতে তার বিপন্ন অস্তিত্বের সঙ্কটকে চিনে নিতে অসুবিধা ঘটে না। বসুধা রানুকে সান্ত্বনা জোগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে নিজেও কী হতাশা এবং সংশয়ানুভূতির শিকার নয়? বসুধা ভালমতন জানে 'বেঁচে থাকা এবং বাঁচিয়ে রাখা'—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা বিরাট। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করেছি ক্ষয়িষ্ণু পারিপার্শ্বিক ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। উৎসাহহীনতা, বিরক্তি, নৈরাশ্য —তাকে, তার সাবলীল সচেতনাকে নির্মূল করতে উদ্যত হয়েছে। শরীরের অসুখ রানুর মনের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। ফলত অপর পাঁচজনের সঙ্গে তৈরি হয়েছে বিরাট দূরত্ব। রানু নিঃসঙ্গতার শিকার যারাত্মকভাবেই। বসুধার জন্যে রানুর আবেগে কোনও ফাঁক নাই ঠিকই; তা সত্ত্বেও এক অনির্ণেয় গ্লানি, দূরবর্তিতা, দু'জনের মধ্যেই বিষণ্ণতাকে ঘনীভূত করেছে। লক্ষ্য করা গেছে—শচীনমামার মৃত্যুজনিত বিমর্ষতা সত্ত্বেও বসুধার সঙ্গে দেখা করার জন্যে যে উৎসাহ রানুর মধ্যে জেগে উঠেছিল, ফিরে যাওয়ার সময় তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।

বসুধা যথেষ্ট সচেতন থেকেও অনিবার্য বেদনার প্রবাহ থেকে রেহাই পায়নি। জন্ম এবং মৃত্যু – আনন্দ ও বিষাদ, —এই দুয়ের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া তাকে অশান্ত করেছে, স্বস্তিহীন করেছে। শচীনবাবুর মৃত্যু বসুধাকে শুধুমাত্র অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেয়নি বা অসুখী-ই করেনি; এ ছাড়াও অন্য কিছু। একটি ভাল

মানুষের মৃত্যু —তাঁর বেদনাঘন জীবনের করুণ বৃত্তান্ত, বসুধার সতর্কতাকে টুকরো টুকরো করেছে। মানবিক সম্পর্কের অধোগামিতা তাকে সংশয়ের অগ্নিকুণ্ডে যে-ভাবে ঠেলে দিয়েছে —তা প্রকৃতই ভয়াবহ।

বিবিও জেনেছে এই পৃথিবীতে ভাল নাই কেউ। ফয়াটে পরিবেশের কঠিন ফাঁসে আমাদের দম ব-ধ হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। রুদ্ধশ্বাস এই পরিবেশে ঠিক মতন বেঁচে থাকার চেষ্টাটাই তাই প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। বিবি তার ক-টকিত বিবাহিত জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে মানবিক সম্পর্কের করুণ অধঃপতন। মানুষ যেখানে জ-তু হয়ে যায়, লাম্পট্য যেখানে বিকৃত কামনার চরম নিদর্শন, জীবনযাত্রার যান যেখানে নিতান্তই আড়ম্বরের বহর মাত্র;—সেখানে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মত সুকুমার অনুভূতি যে মাথা কুটে মরবে —তাতে আর সন্দেহ কোথায়? আভিজাত্য শুধু বাইরের চোখ ধাঁধানো বাহার নয়, সেটা অন্তরের ঐশ্বর্য —আচরণের সুভদ্র আবেদনও, বিবি তা জানত। এবং এই জন্যেই নির্দ্বিধায় সে সব কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত পর্যন্ত করা হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে। বিবির চোখ থেকে স্বপ্ন মুছে গেছে কবেই। অ-সুখের তীব্র বেদনায় নীল হয়েছে শরীর। তবুও সে থেমে যায়নি। নারীত্বের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিবি বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে কিছু অমানুষের খপ্পর থেকে। জেহাদের প্রকাশ বিবির মধ্যে ঘটেছে, কি-তু অনুচ্চারিত থেকে গেছে আশাবাদের বি-দুমাত্র সম্ভাবনাও। তাই হতাশ্বাস থেকে জ-ম নিয়েছে চরম নৈরাশ্য : 'আমরা কেউ অলরাইট নেই।'

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পৃথিবীতে আমরা প্রতিটি মুহূর্তেই ভেসে চলেছি এক অনিবার্য স্রোতধারায়। সে স্রোত বেদনার। সুখ - সুস্তি-নিরাপত্তা এখানে আশ্রয়বিহীন। শুষ্কপ্রায় ভালবাসা এবং মমতার উৎস। বেঁচে থাকাটা এখন নিতান্তই এক প্রহসন। তবুও শেষ পর্যন্ত সেই প্রহেলিকার মধ্যেই এগিয়ে যেতে হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে — টলতে-টলতে আমাদের সেই যাত্রা। লক্ষ্য কি-তু অ-ধরাই। অতৃপ্ত অসুখী সত্তা সহসাই মুখ থুবড়ে পড়ে। জ-মদিন এবং মৃত্যুদিন এই ভাবেই মিলে-মিশে একাকার। 'বেদনার স্রোত শুধু অব্যাহত, শেষ নাই তার।'

বিচিত্র আমাদের স্বভাব । আচরণের প্রকৃতি দিয়ে সর্বদা এই মানসিক ধরনটিকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । বাহ্যত যা ঘৃণা ও ক্রোধের বিস্ফোরণ, গভীরে তাই আবার ভালবাসার নির্বাধ ফল্গুধারা । জীবনের সেই ক্ষতহীন বিস্ময়কেই কথা-সাহিত্যিক তাঁর 'গ্রন্থি' (১৯৮৮) উপন্যাসটির মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন । মা এবং ছেলের মধ্যে যে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের দেওয়ালটা এতকাল ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেটাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে । বেদনার সজল আভাসের চিহ্ন নিয়ে দুটি ক্ষতরের গ্রন্থি উন্মোচনে অব্যর্থ হয়ে উঠেছে স্নেহার্দ্র সত্যের অমোঘ ইঙ্গিত ।

উপন্যাসটি মূলত এক অভিনেত্রী জীবনের সকরুণ আলেখ্য । অভিনয় জগতের 'ছোট তারা' হিসাবে স্বীকৃত বিজলি একদা অনেক কিছুই পেয়েছিল । খ্যাতি, স্তুতি, অর্থ, — সব কিছু । একদিন কি-তু ঘনিয়ে এল তাঁর ফুরিয়ে যাওয়ার বেলা । বড়ই মর্মান্তিক আর দুঃসহ সেই সময় । দুঃখের দিনগুলিতে প্রায় সবাই পরিত্যাগ করেছে বিজলিকে । এখন কোনওরকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় একদা খ্যাতিময়ী নায়িকাকে । এখানে-ওখানে একটু-আধটু ডাকের জন্যে এক বুক অভিমান নিয়েই অপেক্ষা করতে হয় তাকে । একমাত্র সন্তান কুমার মায়ের কাছেই থাকে । কি-তু কিছু নিয়ম-মাফিক ব্যাপার ছাড়া দু'জনেই পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । খসে পড়া 'ছোট তারা' এখন কাউকেই সহ্য করতে পারে না । নিজেকে বড় অসহায় আর বঞ্চিত মনে হয় তাঁর । তাসত্ত্বেও একদিন কি-তু সন্তানের কাছে মা ধরা পড়ল মায়ের মত করেই । বিদায়ের আকুতিমাখা দিনে মা ছেলেকে বলে যায় --ভালবাসা ছাড়া এ-জীবন অর্থহীন । ভালবাসার অভাবে —সুখের অভাবে এই জীবন বড় দুঃসহ । এতদিন শুধু ফন্ত্রণাই সয়ে এসেছে কুমার ; এখন সে বুঝতে পারে মায়ের মমতা কত গভীর এবং অনিঃশেষ । ভালবাসার যাদুস্পর্শে নিমেষে মুছে যায় তার যাবতীয় ক্ষোভ, ব্যথা আর হাহাকার ।

উপন্যাসটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মা এবং ছেলে, --অর্থাৎ বিজলি এবং কুমারের প্রসঙ্গ । এই বৃত্তে বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি নাম --মানিক দত্ত

এবং নববাবু । এ ছাড়া কমলা মাসি , ফটিক , নকুল , রজত , মোহাগ , -প্রভৃতি চরিত্রগুলিও স্বল্প অবকাশেই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । প্রায় সকলেই সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে নির্বাসিত । আত্মাভিমান , ব্যভিচার , ঈর্ষা , ক্ষোভ , হিংসা, প্রতারণা , বঞ্চনা এবং কখনও কখনও শরীরগত ব্যাধি উপন্যাসভুক্ত বিভিন্ন চরিত্রগুলির সঙ্গে ছায়ার মতই জড়িয়ে গেছে ।

উপন্যাসের প্রথম ভাগে কুমার তার মায়ের যে বর্ণনা দিয়েছে , --তাতে তাঁর আকৃতিগত পরিচয় যেমন পাওয়া গেছে তেমনি মিলেছে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও ।

> এখন আমার মায়ের বয়েস পঞ্চাশের বেশি ।
> বাহান্ন, চুয়ান্ন না ছাপ্পান্ন তা আমি জানি না ।
> বয়সে চেহারা পাল্টায় । মায়ের চেহারাও পালটেছে।
> শরীর মাঝারি ভারি , গায়ের রঙ হলদেটে হয়ে এসেছে ,
> জ্বলে-যাওয়া গিন্টির গয়নার মতন । মাথার অর্ধেক
> চুল পাকা , মাঝে মাঝে কলপ দিতে হয়,গোটা চারেক
> দাঁত বাঁধাতে হয়েছে । তবু এই বয়েসেও মায়ের
> গড়নের মধ্যে খানিকটা বাঁধুনি , মানানসই ভাব রয়েছে ।
>
> মায়ের মুখ আমি বড় একটা ভাল করে দেখতে
> পারি না । দেখার ইচ্ছে বা আগ্রহ হয় না । মা বেশির
> ভাগ সময়ে বিরক্ত , অসন্তুষ্ট । কেমন একটা ক্ষোভ আর
> রাগে মুখ করে থাকে । কথাবার্তা থেকে মনে হয় , মাকে
> যেন কারা জব্দ করার চেষ্টাই করে যাচ্ছে । বঞ্চনা
> করছে তাকে।শত্রুতা । মায়ের যা যা প্রাপ্য ছিল , কিছুই
> দিচ্ছে না । না দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ।
>
> এই অসন্তোষ , ক্ষোভ , জ্বালা মনে পুষতে পুষতে
> মায়ের কথাবার্তা রুক্ষ , বাঁকা হয়ে গিয়েছে । নিষ্প্রাণ ।
> গলার স্বর শক্ত । সামান্য কর্কশ । খুশি চোখে মা

> কারো দিকে তাকাতে পারে না। বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে। হয়ত ঘৃণার চোখেই।

কুমারের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শরীরে ও মনে—দুই দিক থেকেই বিজলি আজ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। আশ্চর্য হয়েই আমরা লক্ষ্য করি ছেলে এবং মায়ের মধ্যে অন্তরের কোনও তাগিদ নাই। দু'জনের মধ্যেই দুস্তর ব্যবধান।

কুমারের যখন জন্ম হয়—তখন তার মায়ের হিরো নববাবু — নবকিশোরবাবু। নববাবু আর তার মা তখন কৃষ্ণকান্তের উইল করছিল জোড় বেঁধে; গোবিন্দলাল আর রোহিনীর ভূমিকাতে। তার নিজের বাবার কথা মনে করতে গিয়ে কিছু কিছু দৃশ্য শুধু ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়:

> একটা দৃশ্য এইরকম: বাবা রাস্তার একটা কুকুরকে ধরে এনে কোলে বসিয়ে নিজের বোতল আর গ্লাস থেকে তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ওটা যে 'ওষুধ' নয়, মদ সেটা আমি পরে বুঝেছি। তবে মা বলত, 'ওষুধ'। আমিও জানতাম ওষুধ। আর একবার দেখেছিলাম, বাবা মায়ের বিছানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে। সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার; বাবা একবার দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে তার হাতের যেখানে সেখানে কেটে পাগলের মত চেঁচাচ্ছিল—নুন দাও, নুন দাও। সে কি রক্ত। বাবার গেঞ্জি, লুঙ্গি রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

অন্যত্রও কুমারের চোখে তার বাবা মানিক দত্তের শোচনীয় মানসিকতার ছবিটি ধরা পড়েছে। এক ভয়ঙ্কর অসুখ মানিক দত্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছিল। কিন্তু কুমারের মনের মধ্যেও সংশয়ের যে কুয়াসা জমেছে—তা মুছে ফেলার সাধ্য কার?

> মানুষ কিসে না পাগল হয়? ভালবাসায় হয়, ঘৃণায় হয়, গ্লানিতে হয়, হিংসেয় হয়। আরও কত কী-তে হয়।

> আমার বাবা, নাট্যকার অভিনেতা, স্টেজ ম্যানেজার মানিক দত্ত গ্লানি আর হিংসেয় পাগল হয়ে গিয়েছিল। সামান্য বড় হয়ে আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। নববাবুকে বাবা সহ্য করতে পারত না। মায়ের সঙ্গে নববাবুর 'বেলফুল' ছিল। বাবা মায়ের বিছানায় দাঁড়িয়ে পেছাপ করতে করতে চেঁচাত, বলত: 'তোমরা শালা এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেলফুল করেছ। আমি পেছাপ করছি। মরো তোমরা। মরো।' বাবা বাড়াবাড়ি করলে সে বাবাকে মারত। যা পেত হাতের সামনে তাই দিয়ে মারত। বাবা লাথি খাওয়া কুকুরের মতন কাঁদত তখন। নববাবুর চোখের জমিতে ছিট ছিল। আমারও আছে।

কমলা মাসির কাছ থেকেও কুমার তার বাবার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। থিয়েটারের নেশা তার বাবাকে গ্রাস করেছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি ব্যাপার নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে হয়েছিল তাকে। কুমারকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত নববাবুর সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল। কুমারকে বিজলি মানুষ করেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পোষণ অনেকাংশেই দায়সারা গোছের। সে প্রসঙ্গে কুমারের ক্ষোভ - অভিমান অপ্রকাশিত নয়:

> মা আমাকে কোনদিনই চোখের মণি করে মানুষ করেনি। আমাকে খাইয়েছে পরিয়েছে, স্কুল কলেজে পড়িয়েছে —এটা ঠিক কিন্তু যা করেছে সেটা কর্তব্য বলে। কিংবা না করলে নয় বলে আমার সম্পর্কে মায়ের কোনো আশা আগ্রহ ছিল না। নিজের মতন করে আমি বড় হয়েছি। আগাছার মতন।

কুমারের বুকের মধ্যে সর্বদাই একটা অসহ্য ব্যথা। নিজের জন্ম নিয়েও তার মনে সংশয় আর সন্দেহের বিষ জ্বালা। আয়নার ভিতরে নিজেকে দেখতে দেখতে কুমারের মনে হয় তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে 'এক ধরনের শয়তানি।' নিজেকে নিয়ে সমীক্ষা করেছে কুমার :

> ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, আমায়
> দেখতে আমার বাবার মতন নয়। মায়ের
> চেহারার সঙ্গে অল্পস্বল্প মিল আছে।
> বাকিটা কার সঙ্গে? * * *
> নিজেকে নজর করে দেখার সময় আমারও
> মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার চোখের
> তলায় এক ধরনের শয়তানি রয়েছে। আমি
> হয়ত মানুষ খুন করতে পারি না, কিন্তু যে
> কোন লোকের সর্বনাশ করতে পারি। খানিকটা
> হিংস্র, নোঙরা, নিষ্ঠুর ভাব আমার চোখের
> তলায় যে আছে এটা আমিও এক সময় বুঝতে
> পারি।

বিজলি দত্তেরও একদিন রমরমা সময় ছিল। তখন সে জ্বলজ্বলে নায়িকা, সেই সময়টা একদিন কখন মিলিয়ে গেল। তার পরেও সে মোটামুটি চালিয়ে নিতে পেরেছে। নায়িকা থেকে উপনায়িকা পর্যায়ে। কিন্তু 'সুদিনের' পর 'মাঝারি দিন'— তারপর এল ঘোর 'দুর্দিন'। কুমারের মুখ থেকে তাদের দুরবস্থার ছবিটি স্পষ্ট আকার নিয়েছে :

> সারা মাসে কটা দিনই বা কাজ পায় মা!
> চার ছ'দিন। অথচ সংসার মাকে গিলে খাচ্ছে।
> টানাটানির শেষ নেই। বিছানা মাদুর নোংরা
> হচ্ছে, চিট হচ্ছে, শাড়ি জামা ফাটছে, ফাঁসছে;
> জলের মতন পাতলা চা, শুকনো পাঁউরুটি, ডালের

মধ্যে কুচো চিংড়ি, পুঁইশাক, কুমড়ো'—
এইভাবে দিন কাটতে লাগল আমাদের।
ওরই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দু চারশো টাকার
কাজ মায়ের হাতে জুটে যেত। সেটাই যা
রক্ষে।

মা ও ছেলে একই সংসারে —একই ছাদের তলায় বাস করে, —অথচ দু'জনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এই দূরত্ব পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতিকেই নির্দেশ করে, —

কি-তু এটা খুবই আশ্চর্যের কথা —
সংসারে আমরা মাত্র দু'জন, তবু দু'জনের
মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যবধান ধীরে ধীরে বছরের
পর বছর গড়ে উঠেছে। আজ আমরা আলাদা
দুটি মানুষ। একই ছাদের তলায় পাশাপাশি
ঘরে থাকি; একই হাঁড়ির ভাত খাই, অথচ
আমাদের মধ্যে যেন কোনো ব-ধন নেই।
না মনের, না হৃদয়ের।

বিজলির শরীর বেশ কিছু দিন যাবৎ খারাপ, জ্বরে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছিল সে। কুমার আগেও একদিন বাথরুমে গিয়ে রক্তের একটা ছোট ডেলা লক্ষ্য করেছিল। সে দিনও করল। 'দোকান থেকে ফিরে রাত্রে স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছি, পায়ের বুড়ো আঙুলে নরম আঁঠালো কী যেন লাগল। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক থোকা রক্ত, ডেলার মতনই।' কুমার চমকে উঠেছে। এর আগে সে মায়ের জন্যে উৎক-ঠা বোধ করেনি। কি-তু বেশ কিছুদিন ধরে নির্জীব শয্যাশায়ী মাকে দেখে তার বুক অজানা আশঙ্কাতে কেঁপে উঠেছে। তারই পাশাপাশি একজন ভয়ঙ্কর রকম কষ্ট পাচ্ছে; আর কুমারের কাছে ব্যাপারটা এখনও কেমন অস্পষ্ট! হোমিও-প্যাথিতে যে কাজ হচ্ছে না, সেটা কুমার বুঝতে পেরেছে। বড় ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্যে সে মাকে বলে। কি-তু স্বভাবসুলভ রূঢ়তার সঙ্গেই ছেলের প্রস্তাব মা অগ্রাহ্য করেছে। 'টাকা ছাড়া বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎছে হয় না।

আমার অত টাকা নেই । ইচ্ছেও নেই ।' কুমার বিচলিত । প্রথম থেকে যদি ভালমতন চিকিৎসা হত —তবুও কথা ছিল । শেষাবধি তার মায়ের কী পরিণাম ঘটবে--সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ।

আগে আমি খুঁটিয়ে অনেক কিছু দেখিনি ।
বুঝিনি । মায়ের শরীর খারাপ হচ্ছিল ,
মাঝে মাঝেই মা বিছানা নিত , মা দিন
দিন দুর্বল , ক্ষীণ , শুকনো হয়ে যাচ্ছিল,
মায়ের শরীর থেকে রক্তপাত ঘটছিল , যন্ত্রণা
মাকে কাঁদাত —আমি দেখেছি । কিন্তু এমন
কেউ ছিল না যে আমাকে মায়ের সব কথা বলবে।
যার পক্ষেও বোধহয় আমাকে সম্ভব ছিল না ।
তাছাড়া , মা এত জেদি , এমন দূরের মানুষ
আমাকে কিছুই বলতে চায়নি । আমার কী
করার আছে ?

কুমার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে । ব-ধুরা তাকে সান্ত্বনা-সমবেদনা জোগানোর চেষ্টা করে । কুমারকে সজেজ করার চেষ্টা করলেও---এই সব তরুণদের কথাবার্তাতেও ঘুরে-ফিরে এসেছে অসুখের প্রসঙ্গই । বিশেষভাবে মনে করতে হয় বাবলুর মন্তব্য : 'এই রোগটা এত স্প্রেড্ করে যাচ্ছে ভাবা যায় না । ডিজিজ অফ সিভিলিজেশান । ক্যানসার আর ক্যানসার । পাগলা করে দিল ।'

চোখের সামনে কুমারকে সব কিছু দেখে যেতে হবে , দেখতে হবে একটা মানুষ অপরিসীম কষ্ট পেতে পেতে শেষ হয়ে যাচ্ছে । এই যন্ত্রণা দেখার যন্ত্রণাটা যে কী তীব্র এবং দুঃসহ , —তা উপলব্ধি করতে পারে কুমার । কষ্টটাকে ভুলে থাকার জন্যে ব-ধুদের সঙ্গে 'এক রাউন্ড' বসেও যায় । কিন্তু নেশার মধ্যেও মায়ের সেই যন্ত্রণাকাতর মুখ ক্রমাগত অস্থির করেছে তাকে । অনুযোগ , আক্ষেপ , অসহায় যন্ত্রণা , — এই সবের ভিতরেও মায়ের সঙ্গে এতদিন পরে অবিচ্ছেদ্য একাত্মতা মানসিক সম্পর্কের মূল্যবোধকে দ্যুতিময় করেছে , সন্দেহ নাই ।

"কি বলব তোকে ...। মাঝে মাঝে মনে হয়,
মা যেন আমাকে টরচার করছে। থ্রু আউট
মাই লাইফ্; এখন আরও বেশি। তুই বুঝবি
না। বিছানায় পড়ে আছে, যন্ত্রণায় মরছে,
রোজ ইনজেকসান দিতে হয়। মায়ের বিছানায়
আমি কত রক্তের দাগও দেখলাম।...

* * * * * *

...মা আমার কাছে কিছু ছিল না এতদিন।
নাথিং। মা ছিল আলাদা। ...এখন কেন
আলাদা থাকছে না।"

ভয়ঙ্কর অসুখ সাধারণত একজনকে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু কুমার যে-ভাবে মায়ের কথা ভাবছিল, তার ব্যথা অনুভব করছিল; তাতে প্রমাণ করা সম্ভব: অসুস্থতা কখনও কখনও পরস্পরের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সেতুও। এতকাল কুমার মায়ের কথা ভাবেনি। নিজেকে নিতান্ত হতভাগ্য বলেই জেনে এসেছে। আজ কিন্তু সত্যিই মায়ের জন্যে কাঁদছিল সে। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। 'নিজের জোরে যে ক'দিন বেঁচে থাকেন। আর ভগবান।'

বেঁচে থাকেন। এই হল বাঁচা!
গাছ থেকে খসে আসা পাতার মতন
বেঁচে থাকা। পাতার কী যন্ত্রণা আছে
যে যন্ত্রণা মানুষের? বিজলির এই
যন্ত্রণা আর কান্না শুধু তার 'ছোট তারা'
এখন নিবে এল। আর কেমনভাবে নিবে
এল দেখো! একদিন এই 'ছোটতারা'
জ্বলজ্বল করে চোখে পড়ছিল যাদের--তারা
কোথায়? যদি তাদের কেউ ঠিক এখন
বাড়ি এসে 'ছোট তারা'কে দেখত, ভয়
পেয়ে যেত, ঘরে দাঁড়াত না, পালিয়ে যেত।

অনেক কাল পরে মায়ের মুখ থেকে 'বাবু' ডাক শুনে চমকে উঠেছে কুমার। ছেলেবেলার নামটা কোথায় যেন হারিয়েছিল এতদিন। মা সন্তানের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়। সতর্কতার সঙ্গেই বুঝিয়ে দেয় সুখ ও অ-সুখের পার্থক্য। কুমারের বুকে জমাট বাঁধা যন্ত্রণাটা আবেগের আকুল স্পর্শে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। কতকাল সে মায়ের মুখে শোনেনি স্নেহের ডাক, পায়নি মমতার বিন্দু। নিজেকে শুধু বঞ্চিত আর হতমান বলেই ভেবে এসেছে এতকাল। কিন্তু যাওয়ার বেলায় এত ভালবাসা —এত মমতা; ভরে এল তার সকল শূন্যতা। অ-সুখের তীব্র জ্বালার অবসানে এই অজস্র সুখের বর্ষণ কুমারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

"বাবু, তুমি আমার সব দোষ ধরো না।"

"মা।"

"শোনো ভালবাসার মধ্যে দিয়ে যারা আসে না তাদের বড় দুঃখ। আমি আসিনি, তুমি আসোনি। তোমার বাবা, আমি—আমরা কেউ ভালবেসে তোমায় আনিনি। তুমি এসেছিলে।...তুমি না — ভালবেসে এ-সংসারে কাউকে এনো না।" মায়ের গলা বুজে গেল। গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল, কাঁপল। চোখ বুজল মা। ঠোঁট ফাঁক। দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। আমি নিঃসাড়। মায়ের হাতের মুঠোয় আমার হাত। বুকের মধ্যে দুঃখ বেদনা যেন হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর বসে থাকতে পারছিলাম না। * * * * *

আমি মাকে কিছু বলিনি। কী বলব? আমি কি বলব, তোমায় আমিও ভালবাসিনি, ঘৃণা করেছি, তুমি আমায় এই সমাজে মুখ তুলতে দিলে না, থিয়েটারের মেয়েছেলের পেটে জন্ম আমি রাস্তার নেড়িকুত্তা হয়ে থাকলাম?

না, আমি তা বলব না তোমায়। তুমি
আমায় ভালবেসে আননি। কিন্তু এই তো
যাবার সময় এত ভালবেসে চলে যাচ্ছ।
আমার ভালবাসা আমি বুঝতে পারিনি।
যাবার সময় আমি বুঝতে পেরেছি।

এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কুমার তার মায়ের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছে -- যা থেকে এতদিন সে ছিল বঞ্চিত। অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন কুমারের দৃষ্টি-প্রদীপকে করেছে উজ্জ্বল; স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সত্যের অমল আভাসটুকুও।

আমি ঠিক জানি না, মায়ের জীবনের
শেষদিনে আমি কি পেলাম? দুঃখ, ভালবাসা,
না অন্য কিছু। মাঝে মাঝে মনে হয়,
মায়ের এই মৃত্যু আর বেদনা যেন আমাদের
মধ্যেকার অন্ধকারে থাকা, আড়ালে থাকা
জটিল সম্পর্ককে স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। বোধ
হয় কোন সত্যকে। জীবনের লুকিয়ে রাখা কোন
কোন বোধকে কি মৃত্যুই প্রকাশ করে দেয়? কী
জানি। এই স্বার্থ, কৃপণতা, আত্মপরতাকে
আর কে প্রকাশ করতে পারে নগ্নভাবে মৃত্যু
ছাড়া? এমন কি আমাদের এই ভালবাসাকেও।

উপন্যাসে কমলামাসি একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পুরানোদের মধ্যে এই কমলাই বিজলীর খোঁজ খবর রাখে। এই চরিত্রটি নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মানবিক সম্পর্কের যে গৌরবহীনতা এবং লজ্জাকর দিকটি প্রত্যক্ষ করেছে -- তাতে বিচলিত হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল; কমলা কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে এখন ভারমুক্ত। কুমারের মুখ থেকে আমরা কমলামাসির ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী শুনে চমকে উঠি। স্বামী মারা যাওয়ার পর মেয়ে-জামাই সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছে।

এখন 'মাসির দু'বেলা ভাত জোটে কিনা সন্দেহ।' ভাঙা মন নিয়ে কমলামাসি একদিন সিদ্ধেশ্বরী মায়ের আশ্রমে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের কথা শুনে মা যা বলল তাতে কমলার চোখ খুলে গেছে।

"তোমায় কী বলল ?"

"বলছি। আমি বললাম, আমাদের মতন মেয়েদের ছেলেপুলে কেন হয়। আমরা মা হই দশমাস পেটে ধরি বলে, নয়ত আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে কুকুর বেড়াল। বুকের মধ্যেটা তো কেউ দেখে না।"

"কী বলল আশ্রমের সিদ্ধেশ্বরী ?"

"বলল জন্ম দেবার কষ্ট ভোগ করেছ বলে মা হয়েছ। সে কষ্ট তোমার সুখের। সন্তান মরে যাবার কষ্ট আর ভোগ না করলে।"

"মানে ?"

"মানেটা আমিও বুঝিনি প্রথমে। পরে বুঝলাম। বুঝলাম আমার মেয়ে কখন থেকে আমাকে ছল চাতুরি করে, নোংরামি করে, মিথ্যে বলে সব কেড়ে-কুড়ে তাড়িয়ে দিল—তখন থেকে সে মরেছে। মনের পাপে মানুষ যত মরে ছেলে, এই দেহের পাপে মরে না। আমার মেয়ে মরেছে, আমি মা হয়ে মরিনি।

নকুল যে পরিপূর্ণ ভাবেই অন্ধকারের জীব, কাহিনীতে তার পরিচয় মিলেছে অবিমিশ্র শয়তানির এমন দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে। নকুল যে-ভাবে রেখার বোনে

ভুলিয়ে, —বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, টাকা-হার ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়েছে এবং 'আরও খারাপ কাজ করেছে' তাতে সামাজিক দূষণের জন্যে প্রত্যক্ষত কারা দায়ী, — তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রেখা টাকা ফেরৎ পাবার আশা নিয়ে কুমারের সাহায্য চেয়েছে। নকুলের সম্বন্ধে কুমার আগে থেকেই সব জানত। তার কাছে দু'বার নকুল শিক্ষাও পেয়েছিল। বিশদভাবে তার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে অনেকের সর্বনাশই সে করেছে। আজ তাকে আর কেউ-ই বিশ্বাস করে না। কুমার জানিয়েছে :

> নকুলের সম্পর্কে আমার খোঁজখবর ভুল হবার
> কথা নয়। পাড়ায় ওর সঙ্গে আড্ডা মারার
> লোক আছে দু-চার জন, কিন্তু ব-ধু নেই।
> আমার ব-ধু আছে। নকুল এতরকম কুকীর্তি
> করেছে, আগাগোড়া, চুরি জোচ্চুরি, ঠগবাজি,
> নোংরামি, বেলাল্লাপনা, মেয়ে ফাঁসানো —যে
> ওকে কেউ বিশ্বাস করে না, পছন্দও করে না।

এদের মত ধান্দাবাজ, প্রতারক অসামাজিক জীবরা বাধা পেলেই মরীয়া হয়ে ওঠে। চেষ্টা করে যে কোনও উপায়ে পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে। কুমারের কাছে বাধা পেয়ে তাকে সায়েস্তা করার জন্যে নকুল বস্তির কিছু ছেলেকে লেলিয়ে দিয়েছে। তারা অন্ধকার গলির মোড়ে চাকু, রড, বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় থেকেছে। সতর্ক কুমার নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু রেহাই মেলে না একটি প্রশ্নের তীব্রতা থেকে। সেটি হল : নকুলের মত সমাজ বিরোধীরা এই সমাজেরই সৃষ্টি। অথচ তাদের সংশোধন কিংবা প্রতিহত করণের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি নিতান্তই দায় সারা গোছের নয়? —অন্যথায় নকুলদের জন্যে শুধুমাত্র কুমারের উপরেই নির্ভরশীল হতে হবে কেন?

উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র ফটিক। সে কুমারের ব-ধু এবং সহযোগী। মা-বাবা নাই তার। আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় তাকে। রোগে ফটিকের শরীরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কথাবার্তার মধ্যে কিন্তু এ-সবের কোনও ছোঁয়া নাই। কুমার তাকে সতর্ক হতে বলেছে, কিন্তু ফটিক পাত্তা দেয়নি। '...টি বি তে আজকাল লোক মরে না। ঘরে ঘরে টি বি রে। সেদিন বলছিল শুনলি না —

রেডিয়োর ডাক্তাররা লেকচার ঝাড়ছিল । টি বি আমাদের জাতীয় রোগ.....। ন্যাশনাল পিকক শালা ! নিজের রোগ-ব্যাধি নিয়ে ফটিক যে শুধু ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে তাই নয়, -- একই সঙ্গে এই সমাজ কাঠামোর আপত ভঙ্গুর দিকটি নিয়েও ব্যঙ্গ করতে আপত্তি নাই তার । মনে হয়, ফটিক তার অসুস্থতা সম্পর্কে পূর্ণ ভাবেই সচেতন । কি-তু প্রতিরোধহীনতার যন্ত্রণা এবং অসহায়তার বোধই তাকে লঘু ও বেপরোয়া করে তুলেছে । অন্যান্য পাঁচ জনের মতন বাঁচবার সাধ তার মধ্যেও আছে, কি-তু সে বুঝে গেছে সামর্থহীনতা ও ভাগ্যের বৈরূপ্য কোনওদিনই এই পৃথিবীতে তাকে সুস্থিতে থাকতে দেবে না । তাই নিজের প্রতি সে এত উদাসীন । মমত্বহীন নিঃসঙ্গ এই পৃথিবীতে সব দুঃখ -- সব কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে যার জুড়ি নাই, সেটি হল 'দিশি', একথা সে নিজে যেমন বুঝেছে --তেমনি বোঝাতে চেষ্টা করেছে ব-ধু কুমারকেও ।

ফুল্লরা কুমারের কাছে কখনও ফুলু, কখনও বা ফুলন । তাদের মধ্যে খোলা-মেলা ব-ধুত্ব । পারস্পরিক নির্ভরতা ও ভালবাসার ব-ধনটি বেশ ভালই জোরে পড়ে যায়। তা সত্ত্বেও কুমারের মনে হয়েছে অনেক কিছুই গোপন থাকে -- যা সহজে বলা যায় না । সে জানে ফুল্লরাকে একটি ছেলে 'জবরদস্তি' করেছিল । 'কি-তু ফুলু কোনোদিন মুখ ফুটে কী বলতে পারে, সে ধর্ষিতা হয়েছিল !' কুমার চিন্তা করেছে :

> জীবনের সঙ্গে গাছপালার একটা মিল আছে ।
> মাটির ওপর যা থাকল – ডালপালা ফল ফুল—
> তা শুকনো হোক পোকায় ধরা হোক সেটা প্রকাশ্য ;
> কি-তু মাটির তলায় যা থাকল --তা কেমন করে দেখানো
> যায় ? গাছ নিজেই কি বোঝে তার কতখানি মাটির
> তলায় কতরকম শেকড়বাকড় ছড়িয়ে দিয়েছে ।

কুমার এবং ফুল্লরা পরস্পরের জন্যে স্বপ্ন দেখলেও নির্মম বাস্তবের দায় মেটাতে দু'জনকেই ছিটকে যেতে হয়েছে । মায়ের অসুখ -'কেমোথেরাপি' ইত্যাদি নিয়েই কুমার ব্যস্ত, সুতরাং ফুল্লরার জন্যে ভাববার মত সময় কোথায় ? ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে অ-সুখ তাদের যে-ভাবে আর্ত করেছে, তা বড় মর্মান্তিক ।

রজত ও সোহাগ কাহিনীর মধ্যে নামে মাত্র উপস্থিত। স্বল্প উপস্থিতির ভিতরেই বোঝা যায় তাদের চিন্তাধারা এবং আচরণ সামাজিক দৃষ্টিতে কতটা জঘন্য।

> রজত আর সোহাগ মেলামেশা করতে
> করতে একটা বিপদ বাধিয়ে ফেলেছিল।
> তবে রজত খুবই চালাক, সোহাগও
> খুকি নয়। ওরা বিপদ বোঝার সঙ্গে
> সঙ্গে এক জায়গায় ব্যবস্থা করে ফেলল।
> চীনে পাড়ার মতন দেখতে একটা বে-পাড়ার
> খুপরি ঘরে বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এল
> দু জনে। কিন্তু মানুষের শরীর বলে কথা।
> সোহাগের নাকি ট্যাকসিতেই শরীর খারাপ করতে
> লাগল। মারাত্মক কিছু নয়। শুধু দুর্বলতা,
> মাথা ঝিমঝিম আর বমি ভাব।

রজত এবং সোহাগের সেদিনকার সঙ্কটে কুমার সাহায্য জুগিয়েছিল। সোহাগ বিপদ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল ঠিকই; কিন্তু এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে —সন্দেহ নাই।

উপন্যাসে মা এবং ছেলের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, ঘৃণা-ক্ষোভ এবং বঞ্চনার স্তর থেকে ভালবাসা ও মমতার পর্যায়ে উত্তরণই ঔপন্যাসিকের মূল বক্তব্য। এই দুই প্রধান চরিত্র ছাড়াও অসুখের উপমাগুলি ব্যাপকভাবে অন্যান্যদের মধ্যেও বর্তমান। কাহিনীর সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের অধোগামিতা। এই অধোগতির কবল থেকে বিজলি, কুমার, মানিক দত্ত, নববাবু, কমলামাসি, ফটিক, ফুল্লরা, নকুল, রজত-সোহাগ—প্রায় কেউ-ই অব্যাহতি প্রায়নি।

একদা 'ছোটতারা' রূপে পরিচিত বিজলির অসুস্থতা—ক্যানসার বাস্তবিকই অসুখ; আবার মানিক দত্ত, নববাবু ও সন্তান কুমারের সঙ্গে সাম্পর্কিক জটিলতা

এবং অভিনেত্রী জীবনের হতাশা জনিত অ-সুখেরও প্রতীক বটে । মনে হয়, যখন সে জ্বলজ্বল করেছিল — তখনও সুখ তার কপালে জোটেনি । নটীর জীবনের অভিশাপ তাকে সুস্থিহীন করেছে । স্বামী মানিক দত্তের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে ছবিটি আমাদের দৃশ্যগোচর হয়েছে —তা ভয়ঙ্কর । নববাবুর সঙ্গে বিজলির সম্পর্কের মধ্যেও সুস্থতা অন্তর্হিত । ঝলমলে দিন থেকে অন্ধকারে নির্বাসন বিজলিকে বিধ্বস্ত করেছে । ভালবাসার ভিতরে কুমার এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেনি । নিজের জন্ম নিয়েও কুমারের মনে সংগুপ্ত রয়েছে সংশয়ের দীনতা । গ্লানির লজ্জা । মা ও ছেলের মধ্যে রয়েছে এক অস্বাভাবিক ব্যবধান । ভয়ঙ্কর ব্যাধি কবলিত মায়ের জন্যে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কুমারকে আকুল হতে হয়েছে । মা তাকে ছেড়ে যাবে —এই ভাবনাতে অস্থির হয়ে উঠেছে কুমার । অবশেষে উত্তরণের সন্ধান মিলেছে । সেখানে একটিই শর্ত । ভালবাসার ভালবাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে বেঁচে থাকাটা যে অসম্ভব – তা বিজলি যেমন বুঝেছে, তেমনি কুমারও । স্নেহ -মমতা-ভালবাসা বর্জিত জীবনের যন্ত্রণা ক্যান্সারের মতনই মারাত্মক ।

কমলামাসি মূল বক্তব্য পরিস্ফুটনে সহায়তা করেছে । বিজলির মনোব্যথার খবর সে রাখে । অসুস্থতার দিনে কমলা তার পাশে থেকেছে, পরিচর্যা করেছে, একই সঙ্গে কুমারকে সান্ত্বনাও দিয়েছে । কমলা নিজেই কিন্তু বঞ্চিত এক নারী । মেয়ে-জামাই সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করে তাকে পরিত্যাগ করেছিল । নিকটাত্মীয়ের এই বেইমানিতে কমলা প্রথমে বেশ মুষড়ে পড়েছিল, পরে সামলে নিয়েছে । সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে উপদেশ পেয়ে সে বুঝেছে যারা তাঁর সঙ্গে এই অমানবিক ব্যবহার করল 'মনের পাপে' মরেছে তারাই, ক্ষতি তার কিছুই হয়নি । অমানবিকতার শিকার হয়েও কমলার এই উপলব্ধি তাঁকে সান্ত্বনা জুগিয়েছে, শক্তির সন্ধান দিয়েছে ।

ফটিকের কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে, তবুও সে নির্বিকার । দুঃখকে কিছুক্ষণ অন্তত ভুলে থাকার জন্যে দিশির নেশাই তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে । আসলে অবক্ষয়ের যন্ত্রণা, অবসাদ তাকে কুরে কুরে খেয়েছে । কোনও প্রতিবিধানই তার চোখে ধরা পড়েনি । চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার ক্ষমতা তার নাই এবং ইচ্ছাও । জন্ম থেকেই এই পৃথিবীতে তারা অবিচ্ছিন্ন বেদনার শিকার, — একথা সে কুমারকে

জানিয়েছে । ব্যাধি-মলিন সমাজ সম্পর্কে অসুস্থ ফটিকের ব্যঙ্গ-প্রবণতা তার মানসিকতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে ।

নকুল এক অন্ধকারের জীব । প্রতারণা, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, বেলেল্লাপনা—সব ধরনের নোংরা কাজেই সে সিদ্ধহস্ত । প্রতিবাদে এরা যে হিংস্র হয়ে ওঠে, সে প্রসঙ্গও কাহিনীর মধ্যে রয়েছে । অন্ধকারের তলদেশ থেকে উঠে আসা এই সমাজ-বিরোধীদের অপরাধপ্রবণতা ক্রমবিস্তারী । নকুল অনেক শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সংশোধিত সে হয়নি । চিন্তা করার মত ঘটনা হল এদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে যে সামাজিক শক্তির প্রয়োজন তা একেবারেই অসংগঠিত । কুমারের মত এক-আধ জন হলেই চলবে না; চেতনার ব্যাপক সঞ্চালনেই এই সব ঘৃণ্য সমাজ বিরোধীদের নির্মূল করা সম্ভব ।

সুখ নাই ফুল্লরার মনে । কতদিন সে অপেক্ষা করল । কিন্তু 'বারোমাস্যা'র দুঃখ দূর হল কোথায়? পনেরো বছর বয়সেই উৎপীড়িতা ফুল্লরা জীবনের নগ্ন দিকটি ভালমতই চিনে গেছে; যদিও কুমারকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে মেলে ধরার আকুল ইচ্ছাতেই বিভোর হয়েছিল সে । কুমার যাতে শক্ত মাটির ও উপর দাঁড়াতে পারে, সেই জন্যে চেষ্টার ঘাটতি নেই তার । তা সত্তেও আমরা দেখেছি, সহসা একটা প্রাচীর মাথা উঁচু করে দুজনকে দুদিকে ঠেলে দিয়েছে । কিছু আগেও যে স্বপ্ন ছিল সুখবিলাসের অভিলাষী, এই মুহূর্তে তাই হয়ে উঠল চরম নৈরাশ্যের মধ্যে সম্ভাবনা-বিহীন । ফুল্লরার প্রতীক্ষা—তার ভালবাসার দাবী, কঠিন আঘাতে টুকরো টুকরো । এ ক্ষেত্রে কুমারকে যেমন দোষ দেওয়া যায় না, তেমনি ফুল্লরাকেও । তাদের এই গ্লানি-বিষাদ এবং অ-সুখের জন্যে দায়ী করতে পারা যায় সমাজের প্রতিকূলতাকে, পারিপার্শিক প্রতিবন্ধতাকে । —এই অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার তাগিদ মূল্যহীন । নিষ্প্রভ ভালবাসার একান্ত আবেদনও ।

রজত এবং সোহাগ যে ভাবে মেলামেশা করেছে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে এই সমাজভুক্ত যুবক-যুবতীদের শারীরিক তাড়না অবৈধভাবে প্রকাশিত, যা অসুস্থতারই নামান্তর । সংযমের অভাব সমস্যাকে কতখানি প্রকট করে তুলতে পারে —রজত ও সোহাগ তার প্রমাণ ।

কাহিনীর অন্তিমে উত্তরণ পর্বটি প্রকৃতই অসাধারণ । সারা জীবন ধরে বিজলি যন্ত্রণার বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে । অনিঃশেষ শূন্যতায় আদ্যন্ত আবৃত থেকেছে সে । ভালবাসা থেকে বিচ্যুতি কুমারের বুকেও হাহাকার জাগিয়েছিল , তাকে হতমান এবং আর্ত করে তুলেছিল । অবশেষে সেই অমৃতময় ভালবাসার আস্বাদ কুমার পেয়েছে , পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকেই।উপন্যাসে ক্যানসারকে চিহ্নিত করে হয়েছে 'ডিজিজ অফ সিভিলিজেশান' হিসাবে । বলা যেতে পারে , ক্যানসার শুধুমাত্র বিজলিকে আক্রমণ করেনি , আক্রান্ত হয়েছে আমাদের চারপাশের সমাজ , তার সম্পূর্ণ পরিকাঠামোই । এবং তা থেকে বাঁচবার উপায় শুধুমাত্র কেমোথেরাপিতে নয় , ভালবাসাতেও ।

শীতার্ত মানুষ এগিয়ে চলেছে ক্ষয়ের দিকে । সর্বগ্রাসী রিক্ততা তাকে গ্রাস করছে । এর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যেটুকু উষ্ণতার প্রয়োজন , তা থেকে সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত । উত্তরের হাওয়া বয়ে চলেছে । কাঁপিয়ে দিয়ে চলেছে সব কিছু । আশাবাদী মানুষের অন্তর , গাছ-গাছালি , আরও কত কি । সমগ্র পৃথিবীটাই অবক্ষয় আর বিষণ্ণতার শিকার হয়েছে আজ ।

ঔপন্যাসিক 'উত্তরের হাওয়া' (১৯৮১) উপন্যাসের মধ্যে এমন কিছু ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন , যার রঙে ধরা পড়েছে ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত । লেখকের অন্যান্য অনেক উপন্যাসের মত এই নামকরণের মধ্যেও রয়েছে প্রতীকী চেতনার পরিচয় । উত্তরের হাওয়া যেন সমাজের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের প্রতীক । আমরা অনেক সময় লোভের বশবর্তী হয়ে,সংযমের বেড়াটাকে বি-দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে এমন কিছু কাজের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলি , যেখানে পরিণামের শক্ত ফাঁসটাই বিভীষিকা হয়ে ওঠে — যা এই উপন্যাসে ঘটেছে । এখানে অধিকাংশ চরিত্র অ-সুখের বেদনায় আতুর । লোভ , অসূয়া, ঘৃণা , অবিশ্বাস , বঞ্চনা , ব্যাধি ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে আদ্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে । উপন্যাসকার আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছেন সেই বধ্যভূমিতে যেখানে মানবিকতা

বিপন্ন, 'স্ট্যাটাস' আর অর্থের লোভ যেখানে পতনের গহ্বর, জীবন যেখানে শুধু প্রবঞ্চনা ও পাপের ফসল, ব্যাধি যেখানে শুধুই অনিঃশেষ আকৃতির বার্তাবহ।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পবিত্র। অফিসে সে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অল্প বয়সেই প্রভূত উন্নতি করেছে। সীমাহীন লোভ কি-তু তাকে টেনে নিয়ে গেছে পতনের অতল গভীরে। স্ত্রী বাসন্তীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক —তার মধ্যে প্রেম বা ভালবাসার চিহ্নমাত্র নাই। পবিত্র যেমন বাসন্তীকে বুঝতে চায়নি, তেমনি বাসন্তীও। বাসন্তীর বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে তার প্রাক্-বিবাহ জীবনের একান্ত আপন নন্দকিশোর স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা সে পবিত্রর কাছে পায়নি। অ-সুখের হাহাকার নিয়েই বাসন্তী নন্দকিশোরকে চিন্তা করেছে; কি-তু যন্ত্রণার উপশম বি-দুমাত্র ঘটেনি, ক্ষত আরও গভীর হয়েছে।

চাঁদু এবং প্রীতি এই উপন্যাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শেষ পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে তাদের সংসারেও। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। জীবনের পথ তাদের জন্যে যাবতীয় মসৃণতা সহ অপেক্ষা করছিল, যদিও চাঁদু বা প্রীতি তার জন্যে অপেক্ষায় থাকেনি। চাঁদুর আত্মহননের ভিতর দিয়েই গুঁড়িয়ে গেছে একটি ছোট নীড়ের পরিপূর্ণ ভাবনা।

মানসী ভেবেছিল প্রতিযোগিতায় সে হারিয়ে দিয়েছে টুনিকে। চিরতোষ আপন হয়েছে তার। কি-তু সবটাই ভুল —মর্মান্তিক ভুল। পালিয়েছে চিরতোষ। মা হয়েছে মানসী। অবাঞ্ছিত সেই মাতৃত্বে সুখ কোথায়? মানসীর সন্তান প্রেয়সী বা আর যাই হোক না কেন, —শ্রেয়সী নয় মোটেই।

পরিমল পবিত্র মেজভাই। ব্যাধি-বিশঙ্কিত তার জীবন। চেনা মানুষের ভিড় থেকে সে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে। পৃথক দৃষ্টিতেই পৃথিবীকে দেখতে চায় সে। পরিমল তার বউদ্দির দুঃখকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে, সে জানে দগদগে ঘা জীবনকে কতখানি বিষময় করে ফেলে। বসন্তের গান লিখতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে পরিমল। শীত তাকে উচ্ছল জগৎ থেকে নির্বাসিত করেছে।

তারাপদ ও অমলা —এক প্রৌঢ় দম্পতি। জীবনের প্রভূত অভিজ্ঞতা, অনেক মাধুর্য আর তিক্ত-তায় তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ। তারাপদ নিজের চোখে দেখে চলেছেন

অবক্ষয়ের মুখ-ব্যাদান । এই প্রৌঢ় মানুষটি যে আদর্শ এবং মূল্যবোধকে এতদিন সযত্নে লালন করে এসেছেন , আত্মজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলেন তার বিপন্ন রূপ --চরম দুর্দশা । শীতের হাওয়া এই ঋজু আদর্শবাদী মানুষটিকেও শুষ্ক ম্লান ও বেদনাতুর করে তুলেছে ।

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের সমগ্র অংশেই বিষণ্ণতা বিস্তৃতি পেয়েছে । এই বিষণ্ণতা স্পর্শ করেছে প্রায় প্রতিটি চরিত্রকেই । উচ্ছ্বাস আর আনন্দ যখন জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে , তখনও বিচারের ভুলে , সংযমের অভাবে , লোভের প্রাবল্যে সব কিছু তছনছ হয়ে যায় ; -- উত্তরের হাওয়া সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটি আমাদের কানে পৌঁছে দিয়েছে । উপন্যাসে কেউ-ই অসুখের কবল থেকে রেহাই পায়নি । শারীরিক অসুস্থতা যেমন আয়ুর প্রদীপকে ক্ষীণ করেছে , তেমনি মানসিক সুখের অভাবও জীবনের প্রহরগুলিকে করেছে ক্ষতবিক্ষত --রক্তাক্ত । আহত-অবসন্ন সত্তা অবশেষে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সর্বনাশের লেলিহ অগ্নিকুণ্ডে । হয়তো সেখানেই মিলবে সমস্ত গ্লানি আর যন্ত্রণার মুক্তি ।

কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় --সুস্থ মূল্যবোধের প্রতি সশ্রদ্ধ পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতায় পবিত্রর অবস্থান । যে-দিন থেকে হাতে বাড়তি টাকা আসতে শুরু হয়েছে --সেদিন থেকে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে পবিত্রেরও। তার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে --'কেমন এক বেশি রকম আধিপত্যের ভাব ।' মজার ব্যাপার হল , স্ত্রী বাসন্তীও সেই বাড়তি টাকার খামটা লক্ষ্মী বলে সযত্নে সরিয়ে রাখতে দ্বিধা করেনি । যেদিন ওটা পবিত্র বাসন্তীর দিকে ছুঁড়ে দেয় --বাসন্তীর বুঝতে অসুবিধা হয় না পবিত্রর মেজাজটা এখন একটু চড়া ধাতেই থাকবে । এ-ছাড়া আরও কিছু উৎপাৎ । পবিত্র এবং বাসন্তীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলির অবসানে ক্লান্ত শরীরে যখন আবেশের ঘোর-- তখন হঠাৎই বাসন্তীর শারীরিক অস্বস্তি আরম্ভ হয় ।

> বাসন্তীর ঘোর লেগেছিল , হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত ,
> হঠাৎ পায়ের আঙুলগুলো ব্যথা করে বেঁকে যেতে
> থাকল । বাঁ পায়ে এরকম মাঝে মাঝেই হয়
> বাসন্তীর । শিরায় টান লাগে , না স্নায়ুগুচ্ছে
> কিছু ঘটে যায় --সে জানে না । পায়ের উরুতে ,
> কখনো তলার দিকে মাংস-পেশীতে , কখনো পায়ের

পাতায়, আঙুলে। পায়ের পাতা, আঙুল বেঁকে যেতে থাকে। আর কী ব্যথা। পায়ের গোছ হলে সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়তে হয়।

* * * * * *

এই ব্যথাটা কেন যে হয়, কেন পায়ের গোছে টান ধরে, পাতা আঙুল বেঁকে যায় — বাসন্তী জানে না। ডাক্তাররা যার যা খুশি বলে। কেউ বলে দুর্বলতা, কেউ বলে ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি, কেউ বলে সিঁড়ি ওঠানামা বেশি হয়ে যায়।

বাপের বাড়িতে বাসন্তী কোনওদিন আরাম বা সুখের মুখ দেখেনি। পবিত্র গৃহিণী হয়ে আসার পর অভাবের জ্বালা থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে। তাদের দৈন্য নিয়ে জ্যেঠা-কাকার পরিবাররা যে বিদ্রূপ করত,—এখন বাসন্তী তার মুখের মত জবাব দিতে পারে। খালি হাতে কোনওদিন সে বাপের বাড়িতে যায় না। তবুও তার বুকের ভিতর আছড়ে পড়ে শূন্যতার ঢেউ। মনে পড়ে যায় নন্দকিশোরকে। সে বাসন্তীরই সমবয়সী; সন্তান না হওয়ার জন্যে বাসন্তীর জ্যেঠাইমা তাকে মানুষ করেছিল।

নন্দ একেবারেই সোনার টুকরো ছেলে। তবে কাচের টুকরো। বাসন্তী জানে, এই কাচের টুকরো তার কিশোরী বয়সে শরীর মনের এমন জায়গায় বিঁধে গিয়েছিল যে আজও তার উদ্ধার ঘটেনি। বাইরে কোন ক্ষত নেই। দাগ নেই। উপায় নেই বোঝার। কিন্তু ভেতরে যে বিঁধে আছে, খচখচ করে।

বিশেষ করে এই সব সময়ে, স্বামী যখন তাকে দুচার শো কি পাঁচ সাতশো টাকা আলমারিতে তুলতে দিয়ে নিজের মরজি, খুশি, পছন্দ মতন তাকে

ভোগ করে । বাসন্তীর তখন মনে হয়,
সে পবিত্রর স্ত্রী নয়, সে তার স্বামীর
রক্ষিতা ।

বাসন্তীর এক-এক সময়ে মনে হত নন্দ তাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে সে মুক্তি পাবে । কিন্তু তেমনটা হল না । হঠাৎই একদিন বিয়ে হয়ে গেল বাসন্তীর ।

কপালে যা জোটে, মেয়েদের বেলায়
তাই নিয়ে সুখী থাকতে, সুখে অভ্যস্ত হতেই
আমরা শিখেছি । বাসন্তীও শিখেছে ।
স্বামীকে সে কখনো অবজ্ঞা করেনি, তাচ্ছিল্য
করেনি । সমস্ত রকম কর্তব্য ও যত্ন – যা
অন্য মেয়েরাও তাদের স্বামীকে করে বাসন্তী
তার কম করেনি । বিমুখ করেনি পবিত্রকে
সংসারে, শয্যায় । সে পবিত্র ছেলের মা
হয়েছে । স্বামীকে সে ভালোওবাসে । কিন্তু
এ-ভালবাসা হল অভ্যেসের, হিসেব নিকেশের,
নিয়ম মানা ভালবাসা । তা হিসেব-মানা হলেও
বাসন্তী বলবে, মায়াময়তা কর্তব্য দুশ্চিন্তা
সুখ দুঃখও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে । এ সব
বাদ দেওয়া যায় না ।

পবিত্রর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাসন্তী প্রায়ই বাপের বাড়িতে যেত, নন্দ কিশোরকে টাকা দিয়ে আসত । জ্যেঠাইমা-জ্যেঠামশায় মারা যাওয়ার পর সে বেশ দুর্দশার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল । টাকা নিতে আপত্তি করলেও বাসন্তী শুনত না । বাসন্তীর দেওর পরিমল নন্দকে চিনত । তার কাছ থেকেই বাসন্তী নন্দকিশোরের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করত । পরিমল একদিন বলল, —

'তোমার নন্দদার টি বি । ভুগছে অনেকদিন ধরেই ।
চেপে রাখত । এখন আর চাপতে পারছে না । ইনজেকশান

ওষুধ চলছে । কি-তু লাভ কি । টিবি
রোগীদের পক্ষে যদ খুব বাজে জিনিস ।
ও আবার দিশি যদ ....'

বাসন্তী সেদিন 'ও মরুক , ওর মরা উচিত' বলে চিৎকার করে উঠেছিল । চলে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়েও পড়েছিল । পরিমলকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল বাসন্তী । অসহ্য যন্ত্রণায় দীর্ণ হচ্ছিল সে ।

অফিস থেকে মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরেছে পবিত্র । ল 'অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অ্যাসিসট্যান্ট যশোধরা তাকে প্রায় লাখ দেড়েক টাকার একটা বিল অবিলম্বে পাস করে দিতে বলেছে । এ-ব্যাপারে এম ডি-র নোট পর্যন্ত এসেছে । পবিত্রর কম করে হাজার দুই টাকা ফসকে গেল । তারপর আবার অফিস এসট্যাবলিশমেন্টের বড়বাবু বঙ্কিম দার কথা-বার্তাও তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে । সম্ভবত পবিত্রর নামে কমপ্লেন গেছে । বাড়িতে এসেও মেজাজ তিরিখে হয়ে থাকে পবিত্র । বাসন্তীকে একদম সহ্য করতে পারে না সে । এক-এক সময় এ রকম হয় । তখন 'অদ্ভুত এক ঘৃণা অনুভব করে স্ত্রীর ওপর । মনে হয় , মূর্খ নির্বোধ স্বার্থপর লোভী এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তার জীবনটাই যেন অশান্তির হয়ে উঠল ! তারাপদও পবিত্রর উদ্বেগ অস্থিরতা লক্ষ্য করেছেন । পবিত্র অন্যত্র চাকরির জন্যে চেষ্টা করছে এটা বোধহয় তাঁর কানে গিয়েছিল । পবিত্রকে ডেকে নিয়ে তিনি বলেন ''অশান্তি মাথায় ঢুকলে আর কাজে মন দেওয়া যায় না । তোমার কি কোনো অশান্তি হচ্ছে ? '' পবিত্র বাবার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে । এ যেন 'ডাক্তারের কাছে রোগ ধরা পড়ার ভয় ! বিষণ্ণতা অনুভব করছিল পবিত্র । তাঁর বাবা নিয়ম-নিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । তাঁর নিজস্ব নীতি ও ধর্মবোধ আছে । অন্যথায় আজ তিনি অনেক সম্পদের মালিক হতে পারতেন । আর পবিত্র বাঁকা রাস্তায় টাকা পকেটে ভরতে চেয়ে বিপদের মুখোমুখি । অফিসে যথেষ্ট দুর্নাম রটেছে , সে মর্যাদা হারাচ্ছে দ্রুত । শেষ পর্যন্ত তাকে বোধহয় অফিসটাই ছাড়তে হবে । --এ সব কি-তু বাবাকে বলতে পারল না পবিত্র , গোপন করে গেল সে ।

আশ্বিনের রোদে বাসন্তী সমস্ত বিছানা বালিশ শাড়ি জামা গরম করতে দিয়েছিল। শেষ দুপুরে যখন সব কিছু জড়ো করছিল, হঠাৎ তার পিঠের তলায় কোমর ঘেঁসে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। মনে হল কেউ যেন ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

দাঁড়াতে পারছিল না বাসন্তী। বিছানার ওপর ডাঁই করে রাখা কাপড় চোপড়ের পাশে বসে পড়ল। ব্যথাটা কোমর থেকে পেট, পেট থেকে তলায় ছড়িয়ে গেল। এমনকি বাসন্তীর মনে হল, তার উরুর দিকেও নেমে গেল।

বার কয়েক ব্যথাটা উঠল, নামল, ছড়াল। যন্ত্রণায় দাঁত চেপে, মাথা নেড়ে কিছুক্ষণ কাটাল বাসন্তী। শেষে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ওষুধ খাবার পর বাসন্তী ঘুমিয়ে পড়েছিল। পবিত্র বাড়ি ফিরে তাকে জাগিয়ে তোলে। বাসন্তীর মুখে তার শারীরিক যন্ত্রণার কথা শুনেও বিন্দুমাত্র সহানুভূতির সঞ্চার হয় না পবিত্রর মনে। বরং বিদ্রূপে বিদ্ধ হতে হয় বাসন্তীকেই।

"তোমার না একসময় ডিসমেনোরিয়া ছিল?"

বাসন্তী অসন্তুষ্ট হল। বিয়ের আগে রোগটা ছিল তার। বোনেরও ছিল। বেশির ভাগ মেয়েরই থাকে। বিয়ের পর কম হতে শুরু করে। এখন নেই। পবিত্র তাকে খোঁচা মারছে। ও কেমন করে বুঝবে, শরীর গড়ার মতন খাওয়া-দাওয়া তাদের ভাগ্যে জুটত না তখন। কত অপরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়েছে। মেয়েলি রোগ হতেই পারে।

বাসন্তী বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে মমতা—তার কি কণামাত্রও পবিত্রর মধ্যে থাকতে নাই? প্রকৃতপক্ষে পবিত্রর ও সব ভাবার সময় ছিল না তখন — আর ইচ্ছাও।

ঘাটশীলা বেড়াতে গিয়েও পবিত্র স্বস্তি পায়নি । ভাবনা-চিন্তা তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না । ফিরে আসার পরেই ভয়ঙ্কর খবরটি শুনল সে । ইনভেসটিগেশানের ব্যাপারে লোক এসেছিল । তারাপদ বললেন , --

"থানা থেকে লোক আসতে পারত ।
কোম্পানি তোমার নামে থানায়
মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশান অফ অ্যাকাউন্টস ,
ফ্রডুলেন্স , মিসইউজ অফ্ মানি--থেফট্--
এই রকম সব চার্জ এনে থানায় কেস
করত --তাহলে সরাসরি থানা থেকেও
কোনো অফিসার আসতে পারত । এরা
পুলিস স্টেশনে যায়নি , আগে প্রাইভেট
ইনভেস্টিগেশান ..."

পবিত্র বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে । বোঝানোর চেষ্টা করেছে -- এটা একটা ষড়যন্ত্র , --'দিস্ ইজ এ ডার্টি গেম এগেনেস্ট মি । অফিস পলিটিকস ।' কি-তু একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে , যখন বাস-তীর নামে জমি কেনার চিঠিটা তারাপদ এগিয়ে দিয়েছেন তার দিকে ।

পবিত্রর গলায় যেন আবার ফাঁস লেগে গেল ।
আরও শক্ত । দমবন্ধ হয়ে আসছিল । মনে
হল , তার পায়ের তলায় মাটি নেই , সহসা
কোন গর্তের মধ্যে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে ।
বাবাকে সে দেখছিল , অথচ পরিষ্কার করে
বাবার মুখ তার চোখে ধরা পড়ছে না ।
অস্পষ্ট ।

পবিত্র শুয়ে পড়েছিল , কি-তু ঘুম আসেনি চোখে । সে বাস-তীকে জানায় --সোনা-দানা , চিটফান্ডের কাগজ , ভাইয়ের নামে করা ব্যাঙ্কের খাতা--সব কিছু বাপের বাড়িতে রেখে আসার দরকার । বাস-তী পবিত্রর কথাতে দ্বিধাগ্রস্ত । এর পর

দু'জনের কথা-বার্তা এবং আচরণ থেকে স্পষ্টতই ধরা পড়ে অবিশ্বাসের অন্ধকার কত মারাত্মক ।

"কেন, মাকে বিশ্বাস নেই ? "
"তুমি এমনভাবে কথা বলো । বিশ্বাস অবিশ্বাসের
কথা নয় । মা বলেই তাকে বিশ্বাস করতে হবে ?
"করবে না কেন ? "
"তুমি তোমার মা বাবা ভাই বোনকে বিশ্বাস করো ?"
বলার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রর যে কী হল,
সে প্রায় খামচে বাসন্তীকে ধরে ফেলল ।
এমনভাবে ধরল যে বাসন্তীর কাঁধের তলায়
বুক আর কন্ঠার কাছটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল ।
"আমার মা বাবা ভাইবোন আর তোমার গুষ্ঠী ?
তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছ । শালা, কোথাকার
এক ভিখিরি, লুচ্চো, নোংরা ফ্যামিলি । বোন
তিনবার পেট খসিয়ে ট্যাকসি ড্রাইভারকে বিয়ে করেছে,
ভাই গুবেট, রাস্তায় বসে লটারির টিকিট বেচে,
আর বাপ তো এক ...." * * *
"ছেড়ে দাও আমায় ?" বাসন্তী ঝটকা মারল । বাঁ হাত
দিয়ে ধাক্কা মারল পবিত্রকে ।
"তোমার গুষ্ঠী ভগবানের গুষ্ঠী । আমায় তুমি শেখাতে
এসেছ । এই গুষ্ঠীর ছেলে তুমি ।
চোর লোভী .... ।" পবিত্র অন্ধকারেই বাসন্তীর
গালে দুটো থাপ্পড় মারল ।'
"চুপ । আর একটা কথা বললে মেরে ফেলব ।"

পবিত্র আর বাসন্তী দু'জনেই অন্ধকার শুধু গায়ে নয়, মনেও মেখে নিয়েছিল, এবং পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । মানুষ ছিল না ওই দুটি মানুষ তখন । ভয়ঙ্কর অসুস্থতা তাদের উন্মাদ করে তুলেছিল । বিবেকের দংশন অসহ্য বড়, কিন্তু

ফেরার রাস্তাও প্রায় ব-ধ । বাস-তী উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল । পবিত্র চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল । কাঁদছিল সেও । পবিত্র তার স্বাভাবিক কা-ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল । ডুবতে-ডুবতে তার মাথার প্রায় ঠিক ছিল না । সে আগে কখনও স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেনি । এই প্রথম । তার সর্বনাশের পেছনে বাস-তীর কতটা হাত থাকতে পারে —ভাবছিল সে । বাস-তী তো তার কাছ থেকেই লোভী আর চতুর হতে শিখেছে । পবিত্র দিয়েছে, বাস-তী নিয়েছে ।

হঠাৎ তার কেমন যেন বিশ্রী লাগল ।
আর কোনদিন যা মনে হয়নি, আজ
আচমকা মনে হল, বাইরের থেকে
যখনই সে টাকাপয়সা নিয়ে এসেছে,
স্ত্রীকে বেশির ভাগ সময় স্ত্রীলোক
হিসেবেই ব্যবহার করেছে । সে নিজের
মধ্যেকার কোনো নোংরামি, অন্যায়বোধকে
ভুলে থাকতে চেয়েছে না স্ত্রীর আবর্জনা
নিক্ষেপের পাত্র বলে মনে করে নিয়েছে ।
অদ্ভুত ! খুবই অদ্ভুত !

বাস-তী ভাবছিল নন্দকিশোরের কথা । সে-দিন নন্দকিশোর তাকে নিয়ে যায়নি, আজও যাবে না ।

যদিও নাই নিয়ে যায় — তবে ওই নন্দ
আর বেঁচে আছে কেন ? মরুক না । মরুক।
বাস-তী মরা মানুষদের নিয়ে বেঁচে থাকতে
শিখে গিয়েছে । সে ভয় পায় না ।

এই উপন্যাসে প্রীতি আর চাঁদু বিশিষ্ট দুই চরিত্র । ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্যে এই নবীন দম্পতির সাফল্য এবং ব্যর্থতা —দুই দিকই তীক্ষ্ণ সচেতনতায় ফুটিয়ে তুলেছেন । প্রীতির সঙ্গে বিয়ের পরেই চাঁদুর বরাত খুলে যায় । তার আগে সে ছিল অনেকের মত নিতান্তই আড্ডা দেওয়া এক যুবক। প্রীতি ভাল চাকরি করত । রিসেপশনিস্ট । ছবি তোলায় ভাল হাত চাঁদুর । প্রীতিকে বিয়ে

করার পর তার 'স্পার্ক স্টুডিও' রীতিমতন 'স্পার্ক' মারছিল। চাঁদুর ফটোগ্রাফির মধ্যে প্রথমদিকে অন্তত বেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

'ডেথ অফ এ বেগার বয়' বলে তার একটা ফটোগ্রাফ দিল্লির কোন একজিবিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। বম্বের এক কাগজে একটা ছবি বেরিয়েছিল চাঁদুর। একটা ন্যাংটো বছর তিনেকের ভিখিরির বাচ্চা—আধখানা রুটি নিয়ে গাছতলায় বসে এক কুকুর বাচ্চাকে রুটি খাওয়াচ্ছে। কুকুর বাচ্চাটার বোধহয় সবেই চোখ ফুটেছে। রুটি খেতে শেখেনি তখনও। দারুণ ছবি, ফ্যান্টাস্টিক ফটোগ্রাফ। ছবিটার নাম দেওয়া হয়েছিল : ইভন্ হি শেয়ারস। নামটা কাগজওলারা দিয়েছিল। টাকা পেয়েছিল চাঁদু, দু'তিনশো। ব-ধুদের খাওয়ালে, তারপর জগব-ধুদের নিয়ে গিয়ে মদ গিলল।

বাবু তখনই বলেছিল, 'চাঁদু, ভিখিরির বাচ্চাটা তোকে টাকা পাইয়ে দিল, তার কি-ত্তু একটা ইজ্জেরও জুটল না।' চাঁদু চটে গেল। বলল, 'বাজে বকিস না। কেরামতি আমার। পরিশ্রম আমার। আমি আমার কাজের দাম পেয়েছি, ভিখিরির বাচ্চাকে ইজ্জের পরাবার দায় আমার নয়। তোদের গভর্নমেন্টের।

অর্থের প্রতি আকর্ষণ চাঁদুর রয়েছে, যেটা উপার্জনকামী অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই থাকে। তা সত্ত্বেও চাঁদু তার পেশার মধ্যে সামাজিক সমস্যা, সাধারণ অবহেলিত জীবনের ছবিকেও ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। এই চাঁদুর মধ্যেই কি-ত্তু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এখন তার কাছে টাকাই সব। এর জন্যে নোংরা ছবি তুলতেও আপত্তি নাই তার। ক্রমশ লোভ তাকে ঠেলে দিয়েছে এক বিপজ্জনক ঘূর্ণির আবর্তে।

প্রীতি প্রতিবাদ করেছিল । কিন্তু চাঁদু কর্ণপাত করেনি তাতে । প্রীতির বুকে যন্ত্রণা জমতেই থাকে । চাঁদু যে এ ভাবে পাল্টে যাবে , এ রকম 'অমানুষ' হয়ে উঠবে সে ভাবতে পারেনি ।

"বাবু , আমি কচি খুকি নই , "প্রীতি বলল ,
"আমি সব বুঝি । চাঁদু এখন বড় ফাঁদে পা
দিয়েছে । তার হাবভাব পালটে গেছে ।
রাত্তিরে এত মদ খায় , মাথার ঠিক থাকে না ।
ছোটলোকের মতন ঝগড়া করে । এই নোংরা ছবি
তোলা নিয়ে আমার সঙ্গে ক'দিন আগে ঝগড়া হয়ে
গেল । ও আমায় একটা ঘুঁষি মারল । মদে তখন
চুর । ঘুঁষিটা আমার কোথায় লেগেছিল , কেমন
কালসিটে পড়ে গিয়েছিল , তোমায় দেখাতে পারলে
বুঝতে । " বলে প্রীতি নিজের বুকের বাঁ স্তনের দিকটা
দেখাল । "যন্ত্রণায় আমি মরে যাই । দুদিন ভাল
করে নিঃশ্বাস নিতে পারিনি ।...ও এমন অমানুষ
হয়ে যাবে ভাবিনি , বাবু । সত্যি ভাবিনি ।"

প্রীতি প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে বলছিল —সে এসব আর সহ্য করবে না । বাবু যেন চাঁদুকে সাবধান করে দেয় । প্রীতিকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল ।

"তুমি যদি না পার , আমি ওকে এমন
শিক্ষা দেব —তখন বুঝবে ; কে কত সেকেলে
আর একেলে । দুটো ন্যাংটা মেয়ের ছবি তুলে
ও একেলে হতে এসেছে ! এক বোতল মদ আর
নচ্ছার ছবি সামনে নিয়ে বসে একেলে হওয়া ,
আমি ওকে দেখাচ্ছি ! "

বাবু ভাবছিল যে চাঁদু কিছুদিন আগে ন্যাংটা ভিখারি বাচ্চার ছবি তুলেছে , কুকুরের বাচ্চার ছবি তুলে পুরস্কার পেয়েছে , বস্তির ছবি তুলে দিয়েছে জার্মান সাহেবকে ;

সেই কিনা আজ ন্যাংটো মেয়ের অশ্লীল ছবি তোলাতে ব্যস্ত । সত্যি —মানুষের কী বিচিত্র পরিবর্তন । প্রীতি শোধ নিয়েছিল । চাঁদুর আচরনে সে বোধকরি পাগল হয়ে গিয়েছিল , অন্যথায় নিজস্ব প্রস্ফুটিত -নগ্ন যৌবনকে কী করে ফটোতে তুলিয়ে নিতে পারল ?

প্রীতির সঙ্গে কথা কাটাকাটি । ঝগড়া ।
আজেবাজে ফটো তোলা নিয়ে চেঁচামেচি ।
চাঁদু খেপামি শুরু করল । যত রাজ্যের
বাজে ফটো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে বলতে
লাগল ,'আমি তুলবো , তুলবো , তুলবো ।
বেশ করব । তোমার যদি মনে হয় , গা
থেকে কাপড় খসলে সতীত্ব যায় , যাও—গিয়ে
বোরখা পরে বসে থাকো !'

* * * * * *

এই রকম বিশ্রী ঝগড়াঝাটির মধ্যে , চাঁদুর
মাথায় যখন নেশা চেপে গিয়েছে —প্রীতি
তার ফটোগুলো চাঁদুর সামনে ফেলে দিল ।
ফেলে দিয়ে বলল , 'আমিও তোমার মতন
বিশটা ফটোগ্রাফারকে আমার পায়ের তলায়
শোয়াতে পারি ।'

চাঁদু এত বড় ধাক্কাটা সহ্য করতে পারেনি । তার শরীর মনে আগুন ধরে গিয়েছিল । মোটর বাইক নিয়ে নেশার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল । কোথায় যাচ্ছে জানত না সে । তারপরেই ঘটল সেই বীভৎস ঘটনা । ট্রামের সামনে পড়ে গিয়েছিল চাঁদু । বলা যায় , ইচ্ছা করেই মৃত্যুর মুখে সঁপে দিল নিজেকে । চাঁদু চলে গেল । রাস্তায় ধুলোয় কাদায় , নোংরায় , রক্তে- মাখামাখি হয়ে চাঁদু দেওয়ালির দিন চলে গেল ।

উপন্যাসে মানসী এবং চিরতোষের মধ্যে যে সম্পর্কের পরিচয় ফুটেছে —তাও সুস্থতারহিত । প্রেম কখনও হয় পদ্ম , কখনও বা শুধুই পাঁক । মানসী চিরতোষের প্রতারণায় সেই পাঁকের মধ্যে ছটফট করেছে ।

একবার মানসীর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ
দেখা দিয়েছিল, মেলানকোলিয়া। তখন
সে নিজের অজান্তেই শাড়িতে আগুন লাগিয়ে
ফেলেছিল। কপাল ভাল, নিজেই শাড়ি
খুলে ফেলে অন্য ঘরে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।
আর একবার সে চিরতোষের কথায় হাতুড়ে
ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছিল। দুবারেই কপাল-
জোরে বেঁচে যায় মানসী।

প্রতিটি মায়ের মধ্যেই থাকে সন্তানের জন্যে অজস্র আকুলতা। মা হয়েও মানসীর মধ্যে কি-তু বি-দুমাত্র সুখ নাই। যে দৈহিক মিলনে প্রেমের কোনও তাগিদ ছিল না? তারই ফলশ্রুতি ওই সন্তান। মানসী তাই টুনিকে জানিয়েছে-বাচ্চা মরা বেরুলেই বাঁচা যায়। এক মর্মবিদারী হাহাকারই তাকে একথা বলতে বাধ্য করেছে। টুনি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কি-তু মানসী শুনতে রাজি নয় কিছুই।

হঠাৎ কেমন খেপার মতন তাকিয়ে থেকে
মানসী টুনির হাত চেপে ধরল। এখন
আমার শরীরটা বড় খারাপ নন্দিতা।
গোড়ায় যদি সাবধান হতাম, এত ঝক্কি
সইতে হত না। কলকাতায় কত ভাল
ক্লিনিক আছে, ডাক্তার আছে। চিরতোষ
আমায় হাতুড়ে লাগিয়ে মেরে ফেলতে
গিয়েছিল। আমি একবার পরিষ্কার হয়ে
নিই, তারপর ওই হারমজাদা শুয়োরের
বাচ্চার গালে জুতো মারব।' বলে অসভ্য
অশ্লীল গালাগাল দিতে লাগল চিরতোষকে।

মানসীর মেয়ে হয়েছিল। প্রেয়সী। এর জন্মের ভিতর কোনও গৌরব ছিল না; কারণ সে শুধুই কামনার ফসল মাত্র। সুদীর্ঘ পথ তাকে বয়ে বেড়াতে হবে কলঙ্ক আর অপমানের বোঝা।

উপন্যাসে তারাপদর ভূমিকাও সবিশেষ তাৎপর্যবাহী । সকলের মধ্যে থেকেও এই প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ মানুষটি এক গভীর মূল্যবোধকে সযত্নে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন । প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক , লোভ , ঈর্ষা , পতন , স্খলন —সব কিছুর মধ্যেও তিনি অবিচলিত । জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই তাঁর সঞ্চয়ে । চোখের সামনে তাঁকে দেখতে হয় নিজের ছেলে বাঁকাপথে মুঠো-মুঠো টাকা নিয়ে পকেট ভরছে । এই তারাপদকে শুনতে হয় এক তরতাজা যুবকের অকাল মৃত্যু-সংবাদ । মেজ ছেলে পরিমল সব কিছু ছেড়ে আশ্রমে চলে গেছে । পরিমল 'লেপার হসপিটাল' নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করলে তারাপদ বলেন:

> "কী হবে লেপার হস্‌পিটাল খুলে ?"
> পরিমল অবাক । বাবার মুখের দিকে
> তাকিয়ে থাকল । তারাপদ কেমন আনগা-
> ভাবেই বললেন ,
> "হাতে পায়ের কুষ্ঠ , শরীরের রোগ ব্যাধি
> সারাওগে তোমরা । ভাল কাজ । কি-তু
> দেশটার মধ্যে যে কুষ্ঠ লেগে গেছে তার
> কি হবে ? পল , আমার মনে হয় ,
> চারদিকে একটা ডেকাডেন্স চলছে । ওতো
> আশ্রম আর হাসপাতাল খুলে সারাতে
> পারবে না ।"

দিনের পর দিন কেটে যায় । অনেক কিছু সয়ে সয়ে তারাপদও কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছেন । ক্ষয়িষ্ণু পারিপার্শ্বিক তাঁর মত স্থিতধী মানুষকেও দুঃখী , অভিমানীও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ।

> অমলা স্বামীকে দেখতে দেখতে বললেন ,
> "সিংহি ডাক্তারকে আর একবার দেখাও ।"
> "দরকার কী ! ছানি কাটাবার আগে বরং
> একবার . . ."

"তোমার শরীরটা হুট্ করে এমন শুকিয়ে আসছে !"

"কিছু নয় । বাতাসের টান । শীত আসছে —। "

* * * * * * *

"শীত আসছে আসুক । তোমার শরীর তাতে শুকোয় কেন ? " অমলা বললেন ।

তারাপদ জবাব দিলেন না কথার ।

অমলা আবার বললেন , "শরীরের দোহাই দিয়ে আমাকে ভোলাবে ! " তারাপদ হাসিমুখে বললেন , "না ।..... ছেলেবেলায় আমরা যখন ছুটি ছাটায় মধুপুরে আমাদের বাড়িতে যেতাম তখন মাধব মালী বলে এক মালী ছিল । সে বলত , জাড়া মানে শীত-- এক একবার বেশি । শুকিয়ে দেয় , আবার কখনো কখনো কম শুকোয় । এবারে বোধহয় শীতের হাওয়ায় বেশি টান রয়েছে , বুঝলে ! "

শীতের উত্তুরে হাওয়া শেষ পর্যন্ত তারাপদকেও কাঁপিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে । 'দেশজোড়া কুষ্ঠ' এই প্রাচীন মানুষটির মন থেকে শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে , বিচলিত করেছে তাঁকে

পরিমল বা পল । নিজের ভয়ঙ্কর অসুস্থতাকে গোপন করার জন্যে সে ঘর ছেড়েছে । নীরবে সরে গেছে আত্মীয়-স্বজন -বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে । আশ্রমিক শান্ত পরিবেশে অবশিষ্ট দিনগুলির জন্যে নিজেকে সুস্থির রাখার ইচ্ছা তার ।

না , পরিমল কাউকেই বলেনি যে , তার আয়ুর , সীমা সীমিত । এমনও হতে পারত , বাড়ি ছাড়ার পর আজ প্রায় বছর দুই যে সে বেঁচে আছে —তা নাও থাকতে পারত । সে বেঁচে আছে, কেমন করে আছে , তাও জানে না । হয়ত শরীরের মধ্যেকার কোনো শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে , কিংবা বেঁচে থাকার যন্ত্রগুলো এখনও কোনরকমে চলছে , চলতে

চলতে হঠাৎ ব-ধ হয়ে যাবে । হঠাৎই ।
ভাগ্যবশে সে এখনও আছে, এই পর্যন্ত ।
ডাক্তাররা মুখ ফুটে কোনদিন কিছু
বলে না । পরিমলকেও কেউ বলে দেয়নি যে
সে নিজের ঠোঁটের তলায় নীল মতন যে
মাংসপি-ডটা জমিয়ে রেখেছে —এটা তার
মরণ চিহ্ন । বলা যেতে পারে মৃত্যুর দংশন।

এই পরিমলই শুধুমাত্র তার বউদিকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিল । অনুভব করেছিল তার যন্ত্রণা । বাস-তীও পরিমলের কাছে সব কিছু স্বীকার করে হালকা হতে চেয়েছে । নন্দকিশোরকে ভালবাসার কথা সে তার কাছে গোপন করেনি । পরিমল এ-কথা কাউকে বলেনি ; কি-তু চিঠির মাধ্যমে বউদিকে জানিয়েছিল —সামনের দিকেই মানুষের যাত্রা, পিছনে নয় । পরিমল ভালমতই বুঝতে পেরেছিল তাদের সংসারে এখন অ-সুখ আর অস্বস্তি । 'অনেক পাতায় পোকা লেগেছে । বিবর্ণ, পোকা-খাওয়া চেহারা ।' পরিমল নিজে থেকে উদ্যম্ত করতে চায়না কোনও জনকে । চায় না তার জন্যে বাবা-মা যন্ত্রণা পাক । ভাই-বোন বেদনা-বিদ্ধ হোক । তাই বাড়ি ছেড়েছে সে । অথচ এই মানুষটি-ই একদিন গান লিখত । তার গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল, সিনেমাতে শোনা গেছে । তবুও জীবনের মধুরিমা থেকে নির্বাসিত হয়ে গেল সে । নিয়তির কাছ থেকে তার কাছে যেন খবর এসে গেছে —'পল আর নয়, তুমি তৈরি হয়ে নাও । আমি আসছি ।'

অবৈধভাবে—অন্যায় সুযোগ নিয়ে নিজেকে জীবনের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা আর সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া যে একই অর্থের বাহক, —সে কথা উত্তরের হাওয়াতে ভেসে এসেছে বারবার । মানুষের চাওয়ার শেষ নাই, শেষ নাই সময়মত থামতে জানারও । তবুও থামতে হয় —থমকে পড়তে হয় । ততক্ষণ কি-তু জীবনের রঙ হয়েছে বিবর্ণ ; শান্তি আর স্থিতির পরিবেশটাও চেহারা নিয়েছে মরুভূমির । উপন্যাসের অসুস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে তারাপদ এবং পরিমলের ভূমিকা অবশ্য অন্যরকম ।

প্রথমজন পরোক্ষভাবে পারিপার্শ্বিকতার শিকার ; আর দ্বিতীয়জন ব্যাধি-বিশঙ্কিত জীবনে মৃত্যুর পদধ্বনি গুণে চলেছে একান্তে । নিজস্ব স্খলন বা ব্যর্থতার জন্যে নয় —পরিবেশ এবং ভাগ্যই তাদের জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিয়েছে হিমেল আস্তরণ ।

পবিত্র এবং বাসন্তীর মধ্যেকার সম্পর্কে অসুস্থতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না । স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালবাসা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহানুভূতিবোধ সম্পূর্ণরূপেই অন্তর্হিত । লোভ ও অবিশ্বাসের মধ্যে ঠুনকো হয়ে উঠেছে তাদের দাম্পত্য জীবন । বাসন্তীর কখনও কখনও মনে হয়েছে সে তার স্বামীর রক্ষিতা । বিবাহপূর্ব জীবনের প্রণয়ী নন্দকিশোরের জন্যে চিন্তা তার ক্ষতকে আরও রক্তাক্ত করেছে । পবিত্র একেবারে নির্গুণ ছিল না । তার সামনেই ছিলেন তারাপদর মতো মানুষ — যিনি অন্যায়কে ঘৃণা করেন ; তবুও উচ্চাভিলাষী পবিত্র বলগাছাড়া লোভের পিঠে সওয়ার হয়ে নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে । আমাদের মনে হয়, পবিত্র এবং বাসন্তীর দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত যদি সুস্থ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হত —তাহলে অসুখ তাদের জীবনে ভয়ঙ্কর থাবা বসাতে পারত না ।

প্রীতি আর চাঁদুর সাজানো-গোছানো সংসারের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে ব্যর্থতার অভিশাপ । অথচ কী ছিল না তাদের । তবুও লোভ আর অসংযম চাঁদুকে ছুঁড়ে দিল নিঃসীম অন্ধকারে । বাসন্তীর মত প্রীতি কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকেনি । চাঁদুকে বুঝিয়েছে, বাধাও দিয়েছে । প্রীতির কোনও কথাকেই পাত্তা দেয়নি চাঁদু । লোভ তাকে বিকৃত করে তুলেছিল । শেষে প্রীতিও আর সামলাতে পারলনা নিজেকে । চাঁদুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে-পথ সে বেছে নিয়েছে —তাও কম ভয়ঙ্কর নয় । নিজের জীবন দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল চাঁদুকে । প্রস্ফুটনের সম্ভাবনায় যে শিল্পী-সত্তা একদা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, —অকালেই ঝরে যেত হল তাকে । পরিবেশগত আনুকূল্য পেয়েও অসুখের কবলে তারা যে-ভাবে ধরা দিল এবং বিধ্বস্ত হল, —তা আতঙ্ককর ।

উপন্যাসে অঙ্কিত মানসী ও চিরতোষের সম্পর্কের ছবিটিও জীবনের হতশ্রী-মলিন দিক্‌কে নির্দেশ করেছে । চিরতোষের সবটাই ছিল অভিনয় । কিন্তু ফাঁদে পা দিয়ে

ফেলেছিল মানসী । অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অগৌরবে সারা জীবন দগ্ধ হতে হবে তাকে ; বিশেষত তার যখন মনে হবে —এই সন্তান কোনওদিনই তার পিতৃপরিচয় পাবে না ।

তারাপদ উপন্যাসে সুস্থ ভূমিকার মধ্যে মানানসই থাকার দরুন সামগ্রিকভাবে অসুস্থতার মালিন্য আরও জমাট বেঁধেছে । সৎ এবং সুস্থ জীবনের প্রতিমূর্তি এই প্রৌঢ়কে বিষাদঘন দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে অবক্ষয় এবং পতনের বাঁধভাঙা তাণ্ডব । তাঁর ধারণা — সারা পৃথিবীতেই আজ ক্যানসার —যা সারিয়ে তোলা দুঃসাধ্য । পবিত্রবাসন্তীর অশান্তি , পরিমলের গৃহত্যাগ , চাঁদুর মৃত্যু –সব কিছু এই প্রবীণ মানুষটি সহ্য করে গেছেন । সুপ্রভা বসুর মৃত্যুতেও বেদনাহত তিনি । অতীতের হারানো সুর হঠাৎই নাড়া দিয়ে গেছে তাঁকে । বাবু আর টুনির জন্যেও তারাপদর যথেষ্ট ভাবনা । কত আলো ছিল এই পৃথিবীতে । এখন চোখ খুললেই হতাশার অন্ধকার । বিশাল বটবৃক্ষের মত মানুষটিও শেষ প্রহরে পৌঁছে অবসন্ন , ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ । শীতের উত্তুরে হাওয়া তাঁকেও কাঁপিয়ে তুলেছে ।

পরিমলের অসুস্থতা সম্পূর্ণই শারীরিক । জীবনকে পরিমল একদিন ভালবেসেছিল । বসন্তের গান লিখতে গিয়েও লেখা হয়নি তার । শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল না যে । মরণ-চিহ্নকে বরণ করে নিয়েই সে অন্তিম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষাতে থেকেছে । সে চায় না তার জন্যে কেউ দুঃখ পাক । পরিমল শারীরিক দিক থেকে ব্যাধিযুক্ত হলেও মানসিক দিক থেকে সর্বপ্রকারের আবিলতা মুক্ত । পরিমল অসহায় , — কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত নয় । সে বিষাদগ্রস্ত —কিন্তু ভয় বিমুক্ত । শান্ত এবং অবিচলিত মানসিকতা নিয়েই সে চরম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করেছে । পরিমল অবিচলিত , কিন্তু আমরা তার জন্যে বিচলিত না হয়ে পারি না । একটি অমল জীবনের করুণ অপচয় আমাদের বেদনাহত করে । ভাগ্যের এই নিষ্ঠুরতা মন থেকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না । উত্তরের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে হয় —এক ভয়ঙ্কর শীতার্ত রাত গভীর থেকে গভীরতর—যেখানে উষ্ণতার আশ্বাস প্রায় অনিশ্চিত ।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ', ১৯৮৯, পৃ: ৬২

২. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', ২য় সং —১৯৯১, পৃ: ২২৩

৩. 'চতুরঙ্গ', রবীন্দ্র রচনাবলী - ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী -সুলভ সং-১৩৯৪, পৃ: ৪৫০

৪. ঐ, পৃ: ৪৪০

৫. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ: ২৩৪

৬. ড. অশ্রুকুমার সিকদার, 'চারিদিকে নবীন যদুর বংশ' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে 'নবীন যদুর বংশ' গ্রন্থে, —১৯৯১, পৃ: ১১০—১১২